শিক্ষা ও সাহিত্য

ডঃ প্রবোধ রাম চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)
এম. এ. বি. টি. পি. এইচ. ডি.
[রীডার—শিক্ষা-বিভাগ, বিশ্বভারতী]

প্রথম মুদ্রণ মে—১৯৬৩

প্রকাশক
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

ব্লক
ব্লক সারভিস
২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবেশক
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

যারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমার মনে
ভিড় করে থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

প্রবন্ধ-সাহিত্য বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে জনমানসে চিরকালই চিন্তার খোরাক যুগিয়ে এসেছে। সমাধানের সম্ভাব্য ইঙ্গিতগুলি তাতে থাকে। সংশ্লিষ্ট সমস্যার সঙ্গে বিশেষ করে শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে দেশের সকলেই অল্প বিস্তর জড়িত। তাই এ সমস্যার আলোচনা যত ব্যাপক হয় ততই মঙ্গল। এতে সকলেরই নিজ নিজ জীবনচর্যায় কিছু না কিছু করণীয় আছে। সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র যত উৎকৃষ্টই হোক তার সযত্ন আহরণ ও প্রয়োগ ছাড়া রোগ দূর হওয়া সম্ভব নয়। সমস্যা যখন দেশের তথা সমাজের, সকলকেই এর সমাধানে হাত লাগাতে হবে। অবশ্য যার যার ভূমিকাটুকু বেছে নিয়ে।

বিশ্বভারতীর শিক্ষা বিভাগের রীডার, আজীবন শিক্ষাব্রতী, সুরসিক, ডক্টর প্রবোধরাম চক্রবর্ত্তী বেশ কিছু কাল যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক তাঁর চিন্তাধারা এবং কর্মজীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা পরিবেশন করে আসছেন। "শিক্ষা ও সাহিত্য" প্রথম খণ্ডে এখন তাঁর একুশটি সুলিখিত প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'তে চলেছে দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে। গ্রন্থকার প্রবীণ শিক্ষক এবং বর্ত্তমানে শিক্ষকদেরও শিক্ষক। দেশ বিদেশের শিক্ষা সমস্যার জটিল তথ্য তাঁর সরস লেখনীতে সাহিত্যের রূপ পেয়েছে। একান্ত দেশপ্রাণ অথচ বহির্জগতের প্রতি খোলা মন—এরূপ লেখকদের চিন্তাধারাই দেশের বিভিন্ন সমস্যার দিগ্‌দর্শনে এবং সমাধানে সহায়ক হয়ে উঠে। ডঃ চক্রবর্ত্তী তাঁর শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার প্রাণমূর্ত্তি, শিক্ষায় সঙ্গীত ও শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োগ-চর্চার কলাকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাগুরু ও সংস্কারকদের কথা নিপুণ ভাবে সাধারণের চোখে তুলে ধরেছেন। সাচ্চা গুড় আঁধারে মিঠা। এই গ্রন্থ পাঠেই এর সম্যক্ পরিচয় লাভ ঘটবে। শিক্ষা-সঙ্কট নিয়ে সবাই আমরা চিন্তিত। এসময় "শিক্ষা ও সাহিত্যে"র আত্মপ্রকাশকে অভিনন্দন জানাই। ভরসা রাখি সমস্যার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে বইখানি দেশের ও দশের কাজে লাগবে। আত্মার খোরাককে বাদ দিলে যে শিক্ষা একান্ত যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং মানুষের প্রয়োজন মিটাতে ব্যর্থ হয়, এসব আলোচনা সারা গ্রন্থখানিতে ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার নীরস ক্ষেত্রকে যে ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজ—সকলের পক্ষেই সরস ও সার্থক করে তোলা যায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে আছে। তাই শিক্ষার কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। জয় হিন্দ্।

নবগ্রাম, হুগলী। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি	১
শিক্ষা ও সঙ্গীত	৭
প্রাণমূর্ত্তি	১৫
শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যাসাগর	১৯
শিক্ষার অর্থনীতি	২৬
শিক্ষাব্রতী লালা লাজপত রায়	৩২
আন্তর্জাতিক সমাজবন্ধন ও শিক্ষক-শিক্ষণ	৪২
আমি পথিক, পথ আমার সাথী	৪৭
নবযুগের বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ	৫৬
বর্ণপরিচয়ে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ	৬৩
শিক্ষক-শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৬৯
সংস্কৃতি ও শিক্ষালয়	৭৪
চিঠির উত্তর	৮১
ও দেশের শিক্ষার রূপ ও স্বরূপের শ্রুতলিখন	৮৬
২২শে শ্রাবণ	৯৮
প্রতিভাসূত্রের দর্পণে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ	১০৫
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে	১১৬
বাংলা সনেটে নূতন সুর	১২৫
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী	১৩৪
শিশু সাহিত্য ও সুকুমার রায়	১৩৮
ধর্ম ও শিক্ষা	১৪২

শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

যে কোন নিয়মেই হোক একদিন জীবধাত্রী ধরিত্রী জন্মলাভ করেছিল পরে জন্মেছিল জীব—আগে প্রসূ পরে প্রসূন। এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, সে প্রসূন এক সময়ে চক্ষুষ্মান ছিলনা। সে জানত না যে, তার ভিতর এক আলোক-বিরহী আত্মা কাঁদছে, চলছে তার মধ্যে বিরহের এক দুশ্চর তপস্যা। অতঃপর কালক্রমে তার সেই জীব তাত্বিক তপস্যা সার্থক হল, ধরা পড়ল আলোকের জ্যোতি তার চক্ষুর বাতায়নে। জৈব ধর্ম্মানুসারী তার এই যে আলোক তীর্থাভিসার, এটিই হল শিক্ষা দর্শনের জীবতত্ত্ব মূলক ভিত্তি। সুতরাং জীবনের সূচনাতে শিক্ষার সূচনাও অজ্ঞাতসারেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। যে নিয়মে জীব তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেকে বাঁচায়-বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী কালের জন্য এক নতুনতর ও সমৃদ্ধতর জীবন-অধ্যায়ের অগ্রদৌত্য সূচিত করে, ঠিক সেই নিয়মে জৈবিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই সে এক মহাজীবনের সন্ধান পেতে চাইল, জানতে চাইল দেহের মধ্যে দেহাতীতকে, বহিরঙের মধ্যে অন্তরঙ্গকে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে, রূপের মধ্যে রূপাতীতকে। তা যদি না হ'ত, তাহলে সে কখনই আবৃত্তচক্ষু হ'য়ে আত্মার আলোকে জ্যোতির্ম্ময়কে দেখতে চাইতনা-প্রকৃতি প্রদত্ত আলোকের বন্যায় চোখ ভাসিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। এমনটি হয়নি বলেই শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠল। শুধু কি তাই? ইতিমধ্যে জীব জগতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী মানুষ গুহা ছেড়ে গৃহে উঠেছে, ইঙ্গিত সমুদ্র পার হয়ে ভাষার তীরে পৌছেচে; ব্যাষ্টি থেকে গোষ্ঠির সম্ভাবনাকে মূল্য দিতে শিখেছে। অনুভব করছে—"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়, যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়, সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে···· সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন, আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন।" এমনি করেই এসে গেল শিক্ষার মনস্তাত্বিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি-যদিও আদিতে তার জীবতাত্বিক ভিত্তিটাই প্রবল ও প্রকট হয়েছিল। এ যেন বাচ্যার্থকে আশ্রয় করে এক বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনায় উত্তরণ। অতঃপর এই ভূমিকাটুকু মনে

রেখে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, দর্শন মাত্রেই জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সুতরাং শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিতেও সে প্রশ্ন উঠেছে। ফলে শিক্ষা জগতের অধিবাসী শিক্ষক শিক্ষার্থী, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষনীয় বিষয়, শিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি সবকিছু জটিল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা দর্শনকে দিতে হয়েছে। এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। এর কারণ হল জীবন ও শিক্ষার অবিভাজ্যতা। ডিউই যথার্থই বলেছেন যে, শিক্ষা ও জীবন অভিন্ন, বস্তুত প্রবহমান নদীর মতই জীবনের নিত্য নূতন বাঁক—নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতা মানেই নিত্য নূতন সমস্যার সমাধানে তপস্যা দিয়ে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস। শিক্ষা দর্শনের ভিত্তি যাই হোকনা কেন, যতরকমই হোকনা কেন, সঙ্গতি স্থাপনই এর মূল বৃন্ত এবং এই সঙ্গতি স্থাপন করা বা করতে শেখাই হল শিক্ষা। কিন্তু যে সঙ্গতি স্থাপন বা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয় কি করে? হয় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে—এক কথায় আমার জানা জগতের সঙ্গে ও তার অধিবাসীর সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে, এমনি করে আমরা যেমন পরিবেশকে পাল্টে দিচ্ছি, তেমনি আমরাও পাল্টে যাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের দৃগ্‌ভঙ্গী, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ আমাদের জীবনচর্যা সব কিছুই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিতে দর্শন ঠিক থাকলেও তার চেহারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ যেন স্বর সমষ্টিকে ওলট-পালট করে নিরবচ্ছিন্ন স্বর গ্রাম সৃষ্টি করে চলা। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষের কথা ধরা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে প্রয়োজনের বিদ্যাকে বলা হ'ত অপরাবিদ্যা। আর তার ওপিঠে ছিল পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান বা পরিপূর্ণ মুক্তি। স্বাধীন ভারতে দেখতে পাই, পর পর তিনটি শিক্ষা-কমিশনে ভারতের আরণ্যক যুগের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুগের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। কৃষিনির্ভর প্রাচীন ভারতীয় সমাজ আজ যান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে। রাজতন্ত্রের আসনে বসেছে গণতন্ত্র। নিরন্ন নির্বীর্য, নিরক্ষর ও নিঃস্ব ভারতবর্ষের পুনর্গঠনে স্বাভাবিক ভাবেই তার শিক্ষাতত্ত্বে স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ, জড়বাদ ও ভাববাদকে সমন্বিত করতে হয়েছে। এই যে সমন্বয় সাধনা, সেটি এখন সব দেশেরই সাধনার বস্তু। হতে

পারে ভারতবর্ষে ভাববাদের প্রাধান্য, হতে পারে ইউরোপে জড়বাদের প্রাধান্য, হতে পারে আমেরিকায় প্রয়োগবাদের প্রাধান্য, কিন্তু শিক্ষার কোনো একটি "বাদ" আজ আর কোন দেশেরই যথা সর্বস্ব নয়। নিজ নিজ দেশের শিক্ষাদর্শনের অসম্পূর্ণতাই তাদিগে আজ অন্যান্য দেশের শিক্ষাদর্শনের ভিতরে প্রবেশ করে একটা উদার আত্মদর্শনের পথ দেখাতে অগ্রসর হয়েছে। প্রমাণ, তুলনা মূলক শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থের প্রাচুর্য। এখানে মনে রাখা দরকার যে, একটা দেশ বা জাতির মানস সত্তা অতঃসলিলা ফল্গুর মত। তাকে জানা মানে পাথর খোঁড়ার সাধনা। সুতরাং কোন দেশের শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি জানতে হলে প্রথমে সেখানকার বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দিকেই নজর দিতে হয়। কারণ বাহির ভিতরেরই প্রতিফলন।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু এই ব্যবস্থাপনা দেশ-কালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই হেতু শিক্ষার বিধি ব্যবস্থাও ক্রম পরিবর্তমান হতে বাধ্য। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে এটি আরও বেশী করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিস্নাত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রয়াস-কৃত অনুপ্রবেশ ও দেশের ভাবী নাগরিকদের কমিউনিষ্ট ষ্টেটের নির্মাতা হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় বিভিন্নস্তরে অকেটাব্রিষ্টস্, কম সোমলস্, ইয়ং পাওনিয়ারস্ প্রভৃতি বিভিন্ন ছাত্র সংস্থার সংগঠনের কথা মনে রাখলেই সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। হিটলারের নেতৃত্বে যে নাৎসী জার্মানীকে আমরা পাই, সেখানেও দেখি নেতৃত্ব পূজা শুরু হয়েছিল রাজনীতির আড়ম্বরবহুল ধুপধুনায়। তাই ওদেশের বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্ম্মসূচীতে আসন গেড়ে বসল 'হিটলার স্যালুট'। গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিটলারী বুটের তলায় নিষ্পেষিত হল। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ বানচাল হয়ে গেল—এল আত্যন্তিক কেন্দ্রিকতা। আবার অর্থনীতির দিক থেকে তাৎকালিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারে 'কমন মার্কেট' গজিয়ে উঠেছে এবং তাই নিয়ে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদদের চোখের ঘুম মাথায় উঠেছে। অথচ 'কমন মার্কেট'-এর একটা সুন্দর দিকও আছে। কারণ যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা আজ নিঃসংশয়ে পরস্পরের মুখাপেক্ষী, সেইহেতু 'কমন মার্কেট'-এর দরজা আক্ষরিক অর্থে "কমন" না হলে কোন দেশই বাঁচতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটা সত্য এবং বোধ করি এই সত্যের ভিত্তিতেই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কারণ চিন্তার রাজ্যে কোথাও এমন একটি উদার ও উন্মুক্ত স্থান যদি না থাকে যে, সেখানে এসে সব আলোক পৌঁছাবে, তাহলে বিশ্ব-মানবাত্মা কখনই চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে না। বস্তুতঃ শিক্ষার রাজ্যে সমৃদ্ধি আসে পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে। ফলে বিভিন্ন দেশে আজ যে পরীক্ষা-সংস্কার, নূতন পাঠ্য-সূচীর প্রবর্তনা, পাঠ্যপুস্তকের সম্পাদনা, গ্রন্থাগার বা গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা যুগোপযোগী সম্বন্ধ স্থাপন, সহ পাঠক্রমিক কার্যা-বলীর মাধ্যমে নূতন উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তা সবই ঐ পাস্পরিক চিন্তার সংমিশ্রণ জাত ফসল অর্থাৎ শিক্ষা ও চিন্তা রাজ্যের খোলা বাজার থেকে আহৃত সম্পদ। ফোর্ড ফাউনডেশন, বৃটিশ কাউনসিল ইন ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সংস্থাগুলি আজ ঐ কমন মার্কেটেরই ভূমিকায় অবতীর্ণ।

মানুষ যখন ঘর বাঁধে, তখন তাকে মজবুত করবার জন্য সে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে বাজার থেকে দড়ি-দড়া কাঠ খড় এক কথায় যাবতীয় মালমশলা যাচাই করে নেয়। একটা জাতির শিক্ষা প্রবর্তনাও ঐ ঘর বাঁধার সামিল। তাই তাকে ভাবতে হয়, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরের মতামতের মূল্যায়ন করতে হয়, অন্যথায় কর্মঠ বৃত্তির ফলে অদূর ভবিষ্যতে তার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া শিক্ষারাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। এই জন্যই কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি যাই হোক না কেন, তাকে অপর দেশের জীবন-দর্শনকেও জানতে হয়। আসলে এই দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই তার আত্মদর্শন ঘটে। এইচ, জি, ওয়েলস্ কোনো প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, অনিবার্য ভাবেই আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তন্তরিতার অবগুণ্ঠন খসে খসে পড়ছে। বলা বাহুল্য এ মন্তব্য শিক্ষাক্ষেত্রেও খাটে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার পাশাপাশি চলেছে শিক্ষাদর্শন; একেবারে গাঁটছড়া বেঁধে, এর সঙ্গে ওর, ওর সঙ্গে এর। আসলে দর্শন হল শিক্ষার মৌলিক নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা। কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য যদিনা তাকে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সাদা কথায় একটি তত্ত্ব অন্যটি প্রয়োগ—একটি মূল্যবোধ অন্যটি মূল্যায়ণ—মূল্যায়ণ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে।

অতঃপর কালক্রমে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির যেমন রকমফের হয়েছে, তেমনি তাকে রূপায়িত করবার জন্য তার প্রয়োগবিধিরও রূপান্তর ঘটেছে। এবার সে আলোচনায় আসা যেতে পারে। শিক্ষাবিদ ভ্যালেনটাইন মন্তব্য

করেছেন যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আত্মরক্ষার তাগিদই ছিল আদিম মানব সমাজের বড় কথা। সুতরাং সে সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় সচেতনতা বা বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, ছিল অন্ধ অনুকরণ। সে সমাজে মানুষ দেখে শিখত—শিখত কাজ করে। ফলে গোটা শিক্ষা প্রণালীটাই ছিল পুনরাবৃত্তি মূলক দৈহিক প্রক্রিয়া বিশেষ। জন ডিউই ঐতিহাসিক সূত্র ধরে দেখিয়েছেন যে, শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটো দিক আছে—এক, চিন্তার দিক; দুই, কর্মের দিক। প্রাচীন সমাজে এ দুটোর ভেদ স্পষ্ট না থাকলেও মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এ দুটো ভেদ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। যখন বুদ্ধিজীবী পুরোহিত সম্প্রদায় শিক্ষা প্রক্রিয়ার চিন্তার দিকটা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কর্ম বা শ্রমের দিকটা অনুন্নত বা তাঁদের কথায় অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দিলেন, তখন দেখতে দেখতে বুদ্ধিজীবি ও শ্রমজীবি সম্প্রদায় গড়ে উঠল এবং চিন্তা ও শ্রমের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রচিত হল। ফলে শিক্ষা প্রণালী হয়ে গেল উপর থেকে ঢেলে দেওয়ার সামিল। শিক্ষক সম্প্রদায় ভাবলেন শিক্ষার্থীদের শূন্য মস্তিষ্ক বোঝাই করাই হল তাঁদের ব্রত। অতএব শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যতই বাড়তে লাগল ততই জোর পড়তে লাগল শিক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার উপর। মনস্থ হচ্ছে কিনা দেখবার অবকাশ রইলনা, শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধোদপি গরীয়সী—ভারতের কথা হলেও তার প্রসার ও প্রচার কিন্তু ইউরোপের নবযুগেও প্রাধান্য পেয়েছিল। অতঃপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাপ্রণালীতে মানবিকতা আত্ম প্রকাশ করল। রক্তচক্ষু শিক্ষকের বদলে এলেন বন্ধু শিক্ষক · বেতের বদলে এল বাঁশী—পুঁথি কেন্দ্রিক শিক্ষার স্থান নিল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং একতরফা ভাষণ সর্ব্বস্ব শিকণ পদ্ধতির উদগতি হল মানবায়নে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ইউরোপের প্রাচীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা রুসোর মধ্যে দিয়ে বর্তমানের তটভূমিতে পৌঁছে ডিউই-প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক-শিক্ষা পদ্ধতির রূপ নিয়েছে। এর মূলকথা হল, শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মের অবিভাজ্যতা। এখানে বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে একটি সমাজ বিশেষ। আর যেখানেই সমাজ সেখানেই সমস্যা। তাই ডিউই-প্রতিষ্ঠিত ল্যাবোরেটারী স্কুলে শিক্ষার্থীরা আজ সমস্যার সমাধানের মাধ্যমেই নিজ নিজ জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে। এর চেয়ে আরও বড় কথা হল এই যে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের আর কোন বিশেষ স্তরে

সীমাবদ্ধ নেই, নেই ভাবীজীবনের প্রস্তুতি হিসাবে। শিক্ষা হয়ে উঠেছে জীবন, জীবন হয়ে উঠেছে শিক্ষা।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও দেখতে পাই যে, বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মাজী প্রমুখ প্রবর্তিত যুগ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নিত্য নূতন নবীকরণের পথধরে একটা বিশেষ জীবন চর্যায় উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরাজ্যে "পেয়েছি আমার শেষ" বলে কোনো কথা নেই। শুধু বলতে পারি যে, শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি ও তার প্রয়োগ জীবন চর্যার সম্পূর্ণ অর্থ না দিতে পারলেও জীবনের এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার একটা অর্থ যে আছে, একটা বিপুল পরিধি যে আছে সেটা অন্ততঃ আমাদের কাছে তুলে ধরে।

শিক্ষাবিদ্ ক্রুবেকার কোনোস্থানে মন্তব্য করেছেন,

** যেহেতু জনসমষ্টির এক বিরাট সংখ্যা ক্ষেত খামারে, কল কারখানায় ও সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরে কাজ করে দিনাতিপাত করে, সেইহেতু শিক্ষা ব্যবস্থাকে শ্রমমুখী করতেই হবে। কিন্তু সে শিক্ষা সম্ভব হতে পারে একমাত্র গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচ আঁটা, শোষণমুক্ত, আর্থিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন কল্যাণকর রাষ্ট্রে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাদর্শনও বোধ করি তার জন্য প্রহর গুনছে।

শিক্ষা ও সঙ্গীত

বিবর্তনবাদের ফলেই হোক, আর বিধাতার শেষ অভিপ্রায় অনুসারেই হোক, মানুষ এক শুভ মুহূর্তে পৃথিবীতে এসেছিল। সে মুহূর্তের সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও এ মহৎ খবরটি আমরা জেনেছি যে, জন্মলগ্নের সঙ্গেই সে তার কান্নার সূতিকাগারকে মুখর করে তুলেছিল। খুব সম্ভবতঃ এর মূলে ছিল তার কোনো বিশেষ অভাববোধকে গাঢ়তম ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবার বাসনা। কিন্তু সে কি শুধু কান্না? তার মধ্যে কি কোনো কোমল স্বর বেজে ওঠে নি? আবার যখন সে হেসেছিল, তখনও কি তার হাসির মধ্যে কোন আনন্দের স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি? অন্যের কান তার সেই অভাববোধ বা আনন্দবোধের স্বরকে ধরতে না পারুক, কিন্তু প্রসূতি তার কান্নার, তার হাসির গানকে কান পেতে শুনেছিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে যতই বিচিত্র এবং বিভিন্ন বোধকে অনুভব করেছে, ততই সেই বিচিত্র ও বিভিন্ন বোধকে বিভিন্ন স্বরে এবং বিভিন্ন সুরে প্রকাশ করেছে। সংগীতের আদি ইতিহাস বোধ হয় এখানেই লুকিয়ে আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মনোভাবকে অতি বাঙ্ময় করে তোলার উপায় স্বরূপেই সংগীতের উৎপত্তি। হার্বার্ট স্পেনসরও তাঁর "দি অরিজিন্ এ্যাণ্ড ফাংশন্ অব মিউজিক" প্রবন্ধে সংগীতের উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন যে, "আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ" মাত্র।

শরীরতত্ত্ববিদেরাও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, স্বরের অনুলোম বিলোমের সঙ্গে আমাদের দেহের ওঠানামা আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটা বিচিত্র যোগ আছে; সত্য বলতে কি, আমাদের দেহ যেন সংগীতময় হয়েই গড়ে ওঠে। কথা বলায় স্বরের উচ্চাবচতা, চলায় চরণের ওঠানামা—এ সব কিছুই যেন দেহের সঙ্গে সংগীতের যোগসূত্রটি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের অঙ্গুলীর হ্রস্বদীর্ঘতাও কি স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘতার কথা মনে করিয়ে দেয় না?

সে যাই হোক, জন্মসূত্রে পাওয়া এ হেন সংগীতও আমাদের শিক্ষালয়ে অনাদৃত ছিল বহুদিন ধরে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একদিন এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে "বিভিন্ন

রাগরাগিণী" রচনা করা হতো। প্রকৃতির সঙ্গে গানের এবং গানের সঙ্গে তার প্রাণের একটা নাড়ীর যোগ ছিল। তাই "ভৈরোঁ" যেন ভোর বেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ, "পরজ" যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা, 'কানাড়া' যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি, 'ভৈরবী' যেন সঙ্গীবিহীন অসীমের চির-বিরহ-বেদনা, 'মূলতান' যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস, 'পূরবী' যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রু মোচন রূপে ভারতীয় সংগীত-শিল্পীর কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। শুধু সংগীত কলাতে নয়, ভারতীয় চিত্রকলাতেও এই সমস্ত রাগরাগিণীর ভাবব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ইতিহাস সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক, কি উচ্চশিক্ষা— কোনখানেই সংগীত তার যথাযথ মর্যাদা পায়নি।

১৯১২ সাল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "দুঃখের বিষয় সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে, আমাদের কলেজ নামক কেরাণিগিরির কারখানা ঘরে শিল্পসংগীতের স্থান নাই এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে সকল বিদ্যালয়কে আমরা ন্যশন্যাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি, সেখানেও কলা বিদ্যার কোন আসন পাতা হইল না।" সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তখনও পর্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষালয় থেকে সংগীতকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। অথচ মজার কথা এই যে, সেদিনও শিক্ষায় সংজ্ঞা দিতে গেলে আমরা চিৎ-শক্তির সঙ্গে হৃৎ-শক্তির উৎকর্ষের কথাটাও ভাবতে লেগেছি। এমন কি সভাসমিতিতেও বলতে শুরু করেছি যে, মানুষকে শিক্ষিত হতে হলে যেমন বুদ্ধির ভাষা, প্রভৃতিকে আয়ত্ত করতে হয়, তেমনি তাকে আবেগের ভাষাও শিখতে হয়। তাকে অনেক দুঃখের মধ্যে উপলব্ধি করতে হয় যে, সে পৃথিবীতে শুধু যন্ত্রের মত কাজ করতে আসে নি, মানুষের মত বাঁচতেও এসেছে। তাকে বুঝতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে বাঁচতে হলে, সমাজের দশজনের মধ্যে একজন হয়ে থাকতে হলে তার শ্রমের মধ্যে বিশ্রামের কলধ্বনিও অন্নবস্ত্রের মত প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়বস্তুর মধ্যে ক্রমশঃ অনেক বৈচিত্র আনা হলেও সুদীর্ঘ কাল ধরে যেটি অন্যতম, স্বাভাবিক এবং জন্মসূত্রে পাওয়া বিষয়বস্তু, সেই সংগীতকে শিক্ষারাজ্যে আমল দেওয়া হল নমো নমো করে।

শিক্ষাবিদেরা ভাবের ভাষা কবিতাকে স্থান দিলেন কিন্তু ভাবের ভাষা—

সংগীতকে "আহা এসে পড়েছে একটু দূরে বসে থাক" বলে অকৃত কর্তব্যের পাপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চাইলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, সংগীতের বড় পরিচয় ওস্তাদের নাম দেওয়া সুরের রাগরাগিণী রূপে নয়, তার বড় পরিচয় মানুষের হৃদয়-সঞ্জাত ভাবের রাগরাগিণীরূপে। এখন ভাবের পরিস্ফুটন যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য চাই ভাষা—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কথায় "ভাবের ভাষা।" কিন্তু এক্ষেত্রে সংগীতের মত একাধারে জোরালো ও রসাল "ভাবের ভাষা" আর কি হতে পারে? সুতরাং একথা আশা করি নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতকেও একাসনে বসানো দরকার।

সুখের বিষয় বর্তমানে মুদালিয়র কমিশন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় সংগীতকে স্থান দিয়েছেন এবং উচ্চশিক্ষাতেও সংগীত অন্যতম বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু স্থান দেওয়াই বড় কথা নয়, তার মান রাখাও চাই। অবশ্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কেবল সংগীত-সাধনায় নিযুক্ত তাদের বেলায় অনেক সুবিধা আছে। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংগীতকেও রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এর যথাযথ মান রক্ষা করা একটা বিরাট সমস্যাবিশেষ। প্রথমতঃ, পাঠ্যসূচী এত বিস্তৃত এবং তারজন্য এত সময় দিতে হয় যে, এ শিল্প-সাধনার জন্য যথোপযুক্ত সময় দেওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠেনা। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত সংগীত-শিক্ষকেরও একান্ত অভাব। তৃতীয়তঃ, যদি বা এক আধজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়, তাহলে যে সব ছাত্রছাত্রী সংগীতকে বিশেষ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন, তাদের তৈরী করতেই ঐ সমস্ত শিক্ষকদের হিমসিম খেতে হয়। ফলে ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ এ ভোজে পাত পায় না। জানি এক্ষেত্রে তর্ক উঠবে যে, যাদের গলার সুর নেই অথচ অসুরের জোর আছে, তাদের জন্য পণ্ডশ্রম না করে দু একজন সংগীত-শিল্পী তৈরী করাই কি ভাল নয়! ভাল কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যান্য কলাবিদ্যার মত গীতিকলাও যে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রাণ পায়। সুতরাং সেই জনসাধারণ, যাঁদের বলা হয় শ্রোতা, তাঁরা যদি এই সব বিদ্যালয় থেকে তৈরী না হতে থাকে, তাহলে এ শিল্পের অকালমৃত্যু ঘটতে বাধ্য। কারণ শ্রোতার সঙ্গে যুক্তাত্মা হয়েই গায়ক বেঁচে থাকে। সংগীতের মুক্তি এইখানেই এবং এটাই হল শিল্পকে রক্ষা করবার ও ছড়িয়ে দেবার সহজ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।

এখন প্রশ্ন হল, বিদ্যালয়ে কিভবে যুগপৎ শ্রোতা ও শিল্পী গড়ে তোলা যায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হলে একটা ছোটখাটো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ছাত্রসমাজের জন্য কণ্ঠসংগীতে কয়েকখানি সুনির্বাচিত জাতীয় ও জনসংগীত এবং যন্ত্রসংগীতে ঐগুলিরই ঐকতান কিছু দিনের মধ্যে মোটামুটি সুষ্ঠুরূপে শেখানো যায়। এর জন্য প্রথমে সকল শ্রেণীকে একসঙ্গে না শিখিয়ে পৃথকভাবে শেখানো দরকার। তাতে শেখা, শেখানো এবং সংশোধন-এই তিন কাজই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া এই উপায়ে সংগীত-প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকেও সহজে আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং, নবম শ্রেণী থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী সংগীতকে একটা বিশেষ বিষয় হিসাবে নিতে পারবেন, তাঁদের নির্বাচনও এখানে হতে পারে। আর, ভাবী সংগীতশিল্পী গঠনে নির্বাচনের গুরুত্ব যে কত বেশী, সে কথা বোধহয় উল্লেখ না করলেও চলে। অতঃপর পৃথকভাবে শেখাতে শেখাতে যখম ঐ নির্বাচিত গানগুলি কণ্ঠে এবং ওদের ঐকতান যন্ত্রে বসে যায়, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ছাত্রসমাজকে সমবেত কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া চলে। এইভাবে শিক্ষার্থীরা যে শুধু রসপিপাসু ও শিল্পী হবার সুযোগ পায় তা নয়, তারা জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যৌথসৃষ্টির আনন্দও উপভোগ করে—অর্জন করে যৌথ চেষ্টার মহৎ গুণাবলী। বহুদিন যাবৎ একাজে ব্রতী থেকে জেনেছি যে, বিদ্যালযের কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বা প্রার্থনার সময় যখন ঐসব সঙ্গীত সমবেতভাবে কণ্ঠে বা যন্ত্রে গীত হয়, তখন সেটি একটি মহৎ প্রেরণারূপে শিশুমনে বাসা বাঁধে। এবং আজও অনেক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে পুরানো দিনের আলাপ আলোচনা করতে গিয়েও দেখি যে, সে প্রেরণা এখনও তাদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। এমনি করে জাতীয় ও জনসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ঋতুবৈচিত্রের সঙ্গে তাল রেখে যদি কতকগুলি সুনির্বাচিত গান শিখিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে এই ছাত্রসমাজই ভবিষ্যতে একদিন যেমন গুণীদের গান "কানের ভিতর দিয়ে মরমে" উপলব্ধি করবে, তেমনি বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে, ঋতুতে ঋতুতে নবনব রাগিণী বাজছে, তাও তারা অন্তঃকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে। উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাদেরই "সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত" হয়, অনুভব করতে পারবে, আপন "হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয় সমুদ্রেরই লীলা" বলে। এইখানেই সংগীতের পরম

প্রভাব এবং সে প্রভাব বিস্তারে সার্থক সহায়তা না করলে আমাদের শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানেরও মুক্তি নেই। কারণ তার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীকে একাধারে ব্যক্তি হিসাবে এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সংগীতকে যথাযথ মর্যাদা দিলে সেটি যেমন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তাকে তৃপ্ত করে উদ্‌বুদ্ধ করবে, তেমনি সামাজিক মানুষ হিসাবেও সে গুণীকে সমাদর করে তাকে সমাজের কাছে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করবে, তার গুণের উৎকর্ষ সাধনে সহায় হবে। বস্তুতঃ গুণীর সঙ্গে গুণগ্রাহীরও জুড়ি-পক্ষম মেলানোই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বড় দায়িত্ব। "একাকী গায়কের নহে তো গান"—একথার যাথার্থ্য এইখানে। এখন সংগীত যদি শিক্ষার অন্যতম জাতীয় ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, এবং সে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সংবৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শিক্ষায় সংগীতের স্থান নির্ণয়ে কোনোরকম ওকালতি না করলেও চলে।

আবার অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনে দেখি যে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে সম্পদে বিপদে সংগীত মানুষের পরম সুখ, পরম আশ্রয় এবং পরমাগতি। বর্তমানকালে শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকেরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এই আশ্রয় আপামর জনসাধারণেরও প্রাপ্য। অবশ্য সংগীতের জয়তিলক পরবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। কিন্তু সিশোর দেখিয়েছেন যে, সঙ্গীত প্রতিভা কিছু স্বতন্ত্রবস্তু নয়। সেটি এককও নয় বা স্বয়ংসম্পূর্ণও নয়, ব্যক্তিত্ব যেমন অনেক বৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত, সংগীত প্রতিভাও তাই। আবার অন্য একজন গবেষকের কথা মেনে নিলে দেখা যায় যে, সুযোগ পেলে এবং সুযোগ নিলে শতকরা নব্বই জন ছাত্রছাত্রী সংগীত শিল্পকে ভবিষ্যৎ বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং অন্ততঃ পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী মধ্যম শ্রেণীর গায়ক হতে পারেন। তাঁর পরিসংখ্যানে বুদ্ধি-বৃত্তির সঙ্গে সংগীত বৃত্তির বেশ একটা ইতিবাচক যোগসূত্র ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ, আইনষ্টাইন, রোমা রোঁলা প্রভৃতি প্রখ্যাত মণীষীদের সংগীত-প্রতিভার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অবশ্য এঁদের বেলায় পরিসংখ্যান ঠিক বলছে কিনা তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথার দরকার নেই। কারণ অসাধারণদের মাপকাঠিও অসাধারণ। তবু যেন মনে হয়, সাধারণদেরও হতাশ হবার কিছু নেই। বার্নফিল্ডও গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, সময় দিলে এবং সুযোগ মিললে আমাদের মত সাধারণ মানুষও এ শিল্পকে উপভোগ করতে পারে; অধিকন্তু পেশা হিসাবেও গ্রহণ করতে পারে। তা

যদি হয়, তাহলে শিক্ষক তৈরী করবার কাজে যাঁরা এবং যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপৃত আছেন তাঁদের এবং সেইসব প্রতিষ্ঠানের এ ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ একদিন সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে এবং সমাজপতিদের ভ্রূকুটি শাসন উপেক্ষা করে তাঁর বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে সংগীত শিল্পকেও সমসম্মানে স্থান দিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত 'বিনয় ভবনে'ও কিছুদিন যাবৎ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সংগীত শিক্ষক তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া এখানে উচ্চ সংগীত শিক্ষার জন্য সংগীত ভবন তো আছেই। এখন এই সব শিক্ষক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে অনেক ছাত্রছাত্রী সংগীত শিক্ষার ভিতর দিয়ে শুধু যে একটা নব জীবনের সন্ধান পাবে তা নয়, ভবিষ্যতে তারা জীবিকারও একটা নূতন পথ পাবে।

পরিশেষে শিক্ষাবিদদের কাছে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন তুলতে চাই। প্রশ্ন হল এই যে, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে সংগীত শিক্ষণ দিতে গিয়ে তাদের আরও কিছু দেওয়া যায় কিনা—আমি বিশেষ করে বলছি শিক্ষাশাস্ত্রের অনুবন্ধ প্রণালীর কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে।" বলেছেন, "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়।" সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ও-দুটোর গাঁটছড়া বাঁধাই আছে, কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে, ভূগোলের সঙ্গে, গণিতের সঙ্গে এমন কি একেবারে গোড়াকার কথা শিশু শিক্ষার্থীর লেখা ও পড়ার সঙ্গে সংগীতের অনুবন্ধ করা যায় কিনা—সেটাই আমার বিশেষ প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত ঘটনা মনে পড়ছে।

কলিকাতায় কলেজে পড়বার সময় মাণিকতলার কাছে একটি নয় দশ বছরের ছেলেকে প্রত্যহ পড়াতে যেতাম। কিন্তু বাপমার প্রাণের এবং আমার টাকার তাগিদ সত্ত্বেও ছ-সাত মাস ধরে চেষ্টা করেও তাকে না পারলাম বর্ণ পরিচয় করাতে, না পারলাম সব কটা অক্ষর লেখাতে। ছেলেটির বাপ মা ভাল করেই বুঝতেন যে, সে মন্দধী। তথাপি সাধারণতঃ গৃহ শিক্ষকদের যে এসব ক্ষেত্রে অযোগ্যতার ছাপ নিয়ে ফিরে যেতে হয়—এবং মাসান্তে একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হতে হয়, সে তথ্যও আমার অজ্ঞাত ছিল

না। সুতরাং যবনিকা পতনের আশঙ্কা নিয়েই প্রত্যহ ছাত্রের বাড়ীতে হাজিরা দিতাম। একদিন দেখি বাড়ীতে কেউ নেই—ছেলেটি একা একা তার পড়ার ঘরে বসে চাপা সুরে গান গাইছে। বলা বাহুল্য, সে তার বাপমার নির্দেশমতই যথা সময়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সৌভাগ্যক্রমেই হোক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, গানের গলা আমি চিনতে পারি। ঘরে ঢুকে বললাম "বাঃ তুমি তো বেশ গাইতে পার—সমস্ত গানটা আমাকে শোনাও।" "আর তো জানিনা স্যার, ঐটুকুই জানি।"—এই কথা বলে ছেলেটি লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরপর তার বাপমায়ের অনুমতি নিয়ে তাকে গান শেখাতে লাগলাম। উল্লেখ করা বাহুল্য যে, অনুবন্ধ প্রণালীর কথাটা তখন পর্যন্ত আমার অজ্ঞাতই ছিল। যাই হোক, এখন থেকে লেখা পড়া শেখানোর সঙ্গে গান শেখানোও শুরু হল। কিন্তু প্রথমটির ফল যথাপূর্বম্ তথাপরম্। আর দ্বিতীয়টির ফল অভূতপূর্ব। মাস তিনেকের পর হিসাব নিয়ে দেখি, যে ছেলেকে ছ-সাত মাসে সন্দেশ রসগোল্লার মত মিষ্টি কবিতারও একটি চরণও গলাধঃকরণ করাতে পারিনি—সেই ছেলেই তিন মাসে সাদামাটা চার পাঁচটা গান বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ রেখে গাইতে পারছে এবং আমার বিশ্বাস আর দু-চারটে গানের বাণীও সে মুখস্থ করতে পারত, যদি তাকে সে গানগুলি সুরে বসিয়ে শেখাতাম। আর একদিন গিয়ে দেখি বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। একখানি বাঁধানো খাতা কিনে তার শেখা গানগুলিকে বানানের উপর যথেচ্ছাচার চালিয়ে লিখে রেখে দিয়েছে। মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য যেন একটি সার্থক বাহন পেলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে সার্থকতার আত্মপ্রসাদ বা ব্যর্থতার গ্লানি কোনটাই আমার ভাগ্যে ঘটেনি। কারণ শীঘ্রই তার পিতার বদলীর আদেশ এল এবং তাঁরা সপরিবারে অন্যত্র চলে গেলেন। ফলে ছেলেটির ভবিষ্যৎ পরিণতি কি হয়েছে তা আজও আমার কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে।

অতঃপর শিক্ষাশাস্ত্র পড়তে গিয়ে ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক অনেক প্রণালীর সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীর বন্ধনও আমায় সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু আজ মনে হয়, সংগীত শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীও বেশ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ সংগীত অতি সাধারণভাবে শিখতে হলেও শিক্ষার্থীকে প্রথমে অজ্ঞাতসারে এবং পরে জ্ঞাতসারে কিছু কিছু ভাষা, সাহিত্য, ছন্দ এবং তার গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। আর একটু

অগ্রসর হলে সংগীতের ভিতর দিয়ে গীতিকারদের পরিচয়—স্থান ও কালের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র, মাঝে মাঝে সংগীত শিল্পীদের জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো ভ্রমণেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এমনি করে দেশের ইতিহাস ভূগোল ও প্রকৃতির সঙ্গে এক কথায় দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় গড়ে ওঠে। তবে আসল কথা হল শিক্ষকের যোগ্যতা। নতুবা অন্যান্য বিষয়বস্তুতেও যেমন অনুবন্ধ প্রণালী ব্যর্থতায় পযবসিত হয়, তেমনি সংগীতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে মাত্র। কিন্তু সংগীতে অনুবন্ধ প্রণালীর বৃহস্পতির দশা ঘটবে কি শনির দশা ঘটবে—সে প্রশ্ন এখন শিক্ষক সমাজের ওপর ছেড়ে দিয়ে শিক্ষাবিভাগের কাছে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁরা যেন সংগীতকে শিক্ষায়তনে স্বাভাবিক করে দেবার ব্যবস্থা করেন। শুধু কণ্ঠে নয়—সংগীতের ব্যাপক অর্থে—নৃত্যে ও বাদ্যে। সেই সঙ্গে প্রধান শিক্ষকেরাও যেন এ বিষয়ে অগ্রণী হন, নতুবা সরকারী শুভেচ্ছা অর্থহীন হবে। কৈশোরে গ্রামের এক বিবাহ বাসরে মায়ের কাছে শেখা একখানি গান গেয়েছিলাম বলে হেডমাষ্টার মশায় আমার পৃষ্ঠদেশে যে অত্যাচার করেছিলেন, তা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দেহলী পার না হওয়া পর্যন্ত আমার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রেখেছিল।

বোধ হয় ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই সেই শিক্ষককে আবার জন্ম নিয়ে বর্ত্তমানে হেডমাষ্টারী করতে হচ্ছে কারণ আজ দেখতে পাচ্ছি তিনিই বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি দিতে। ফলে মুক্তি ঘটেছে তাঁর মনে, তাঁর কণ্ঠে, তাঁর চরণে। আজ ওদের দিকে তাকালে আমার হারানো দিনের বেতের স্মৃতি বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে।

প্রাণমূর্ত্তি

অর্ধশতাব্দী জোড়া জীবন-জ্যামিতির মধ্যে ছাত্রজীবনের পরিধি কতটুকু, তাই আজ বসে বসে ভাবছি। এর মধ্যে অনেক কথাই আজ কান্নার সুরে ভারাক্রান্ত। তবু তার মধ্যেই একজন শিক্ষকের স্মৃতি মাঝে মাঝে আজও গান হয়ে বেজে ওঠে। এঁকে পেয়েছিলাম আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্লাশে। আজ মনে পড়ে, সেদিন তাঁর অনেক কথা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু না বুঝেও যা পেতাম, তার মূল্য মাপতে পারি, এমন মানদণ্ড তো আজও খুঁজে পেলাম না। ক্রমে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের দেহলী পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি—সেখানে সাহিত্যের ক্লাসে শুনেছি সাহিত্যের দেহ-আত্মা নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা; ইতিহাসের ক্লাসে শুনেছি কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী-সভ্যতার কথা। অবশেষে জীবিকার অন্বেষণে শিক্ষাকতা গ্রহণ করেছি এবং সুদীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে হয়তো বা শিক্ষক হিসাবে কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছি। তবু যেন তৃপ্তি পাই না। বারবার প্রশ্ন জাগে—ছাত্রদের যা দিতে চাই, তা দিতে পারছি কি? আবার যা তাদের কাছে পেতে চাই তাও কি পাচ্ছি? সদুত্তর মেলে না। কিন্তু উত্তর পেয়েছিলাম—পেয়েছিলাম অতি অপ্রত্যাশিত অথচ অতি সংক্ষেপে। আজ সেই ঘটনার কথাই বলতে বসেছি।

রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কৈশোরে ফেলে-আসা গ্রাম থেকে একটি নিমন্ত্রণ-পত্র পেলাম। উদ্দেশ্য, সেখানকার সাহিত্য-সভায় আমায় কিছু বলতে হবে। যথানির্দিষ্ট দিনে গ্রামে ঢুকতেই, প্রথম দেখা হল আমার কিশোর বয়সের সেই প্রথম শিক্ষাগুরুর সঙ্গে। "ভাল আছেন পণ্ডিত মশায়? চিনতে পারছেন?" প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম। চিনতে দেরী হলনা—যদিও তাঁর দৃষ্টিশক্তি বেশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। "চিনতে পারব না কিরে? তোর গলার আওয়াজ শুনেই ধরেছি। বেশ, বেশ, বেঁচে থাক—দেহে-মনে আরও বড় হ"—বলে আমার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন। মনে পড়ল, কলেজের ছুটিতে বাড়ী গেলে আমার স্বর্গত পিতৃদেবও এমনি করে আমায় তাঁর স্নেহস্পর্শ দিতেন। "আয় আয় ভিতরে আয়। ওগো, দেখবে এস—কে এসেছে!" পণ্ডিত মশায় মুখর হয়ে উঠলেন। ক্রমে ও-পাড়া সাজ

হলে, সেই আদি ও অকৃত্রিম দারিদ্র্যের ছাপমারা দাওয়ার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা পণ্ডিত মশায়! সারাজীবন তো এই গ্রামের মাইনের স্কুলে শিক্ষকতা করেই কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু বিনিময়ে কি পেলেন! দেশের স্বাধীন সরকারই বা আপনাকে কোন্ স্বীকৃতি দিলে?" পণ্ডিত মশায় যেন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে বললেন, "সরকার মূল্য দিক আর নাই দিক, তোদের কাছে তো আমার মূল্য পেয়েছি। তাছাড়া, ওদের দিক থেকে মূল্য পাইনি -একথাই বা বলি কি করে! এই যে তোরা আমার আজ এক একটা দিক্‌পাল হয়ে কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কেউ বিচার বিভাগে, কেউ শাসন বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিস—এতেই তো আমার সরকারী স্বীকৃতি মিলেছে। ইতিহাস পড়েছিস্ তো; তার সবটাই লিখিত ইতিহাস নয় —অলিখিত ইতিহাসে আছে। তার পাঠোদ্ধার করতে হয় অন্তর দিয়ে— বাইরের চোখ দিয়ে নয়। এই যে তুই শিক্ষকতা করছিস্—তার ফলাফল কি শুধু ছাত্রদের মৌখিক বা লিখিত উত্তর থেকে বুঝে নিবি না তাদের মধ্যে যে অলিখিত প্রশ্নোত্তর চলে তারও হিসাব নিবি। আসলে তোর দেওয়ার মধ্যে যেমন একটা বাইরের ও ভিতরের সম্মিলিত রূপ আছে, তেমনি ছাত্রদের নেওয়ার মধ্যেও সেই রকম একটা রূপ গড়ে ওঠে। লিখিত আর অলিখিতের এই দ্বৈতলীলাই হচ্ছে সকল বস্তুর প্রাণ—তা সে ইতিহাসই হোক, সাহিত্যই হোক- আর শিক্ষাপ্রণালীই হোক! শিক্ষাপ্রণালীর কথা বলতে গিয়ে নিশ্চয় তার ভিতর বাহির, দেহ-আত্মার কথা প্রায়ই বলে থাকিস্। এও তো সেই লিখিত আর অলিখিতের দ্বৈতলীলা। এই ছাখ্, মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গল্প করতে বসলাম—তোর কাছে এনে ফেললাম শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা।" এতক্ষণ একটানা কথা বলে পণ্ডিত মশায় সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন। মনে হল আমার বহু দিনের একটি অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর-আভাস তাঁর কথার স্রোতে ভেসে আসছে। সবিনয়ে বললাম, "যে বিশেষণগুলি আপনার ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন, তা অন্ততঃ আমার জন্য নয়। কিন্তু সে কথা থাক। আমার কথা হল শিক্ষাতত্ত্বের ঐ দ্বৈত-রূপটি জানা থাকলেও যখন বাস্তবে নেমে এসে ক্লাসে ঢুকি, তখন দেখি যে, ওরা পরস্পর পরস্পরকে "যুদ্ধম্ দেহি" বলে রুখে দাঁড়িয়েছে। এখন কাকে রেখে কাকে ফেলি?" এ প্রশ্ন শুনে তাঁর সর্বদেহে একটা শিশু-সুলভ হাসির ঢেউ খেলে গেল। ঢেউ থামলে বললেন, ওদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়াই তোর কাজ—এটাকে রেখে অন্যটাকে ফেলে দেওয়ার কথা

ভাবিস্ কেন? তোরাই তো বলিস্ শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষার্থীকে জানতে হবে। কিন্তু সে কি শুধু তার মনকে জানা? না তার দেহকেও জানা? তেমনি ধর, পড়াবি কাব্য। কিন্তু কাব্য পড়াবি জানবিনে তার ছন্দ, তার অলঙ্কার, তার কাঠামো, তার দেহ, অথচ ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করবি তার রস—দেখাবি তার আত্মা? আসলে ও দুটো বস্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত —ও-দুটোকে যুগপৎ তুলে ধরতে পারলেই শিক্ষার প্রাণমূর্তি গড়ে ওঠে।" সবিনয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—"এ প্রাণমূর্তি কখনও দেখেছেন?" প্রশ্ন শুনে তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। মনে হল যেন সেই প্রাণমূর্তিকে তিনি আমার সামনে বসেই আর একবার দেখে নিলেন। পরে বললেন, "দেখেছি, যেমন করে তোকে দেখছি। কিন্তু দেখাতে পারিনে যদি না তুই দেখতে চেষ্টা করিস্, সে যে ভাষার অতীত-তীরে—সে যে অলিখিত বাণী।" কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল, পরে বললেন—"একটা গল্প বলি শোন।"

"এখানে এক মাইনর স্কুল হবার আগে একটা পাঠশালা খুলেছিলাম—একটা চালাঘরকে আশ্রয় করে। তার দেওয়াল থেকে ছাউনি, ব্লাকবোর্ড থেকে ডাষ্টার পর্যন্ত সব কিছুই অনেকখানি আমার নিজের হাতের গড়া। এখানেই বসত আমার পাঠশালা, সকালে বিকালে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে। তারপর একদিন কাল বৈশাখীর ঝড়ে তার ছাউনি গেল উড়ে, দেওয়াল গেল পড়ে, ব্ল্যাকবোর্ড গেল ভেঙে। তোরা তো এগুলোকে শিক্ষার বহিরঙ্গ বলেই ধরিস্। কিন্তু শুনে হাসবি যে, আমার পাঠশালার এই বহিরঙ্গ-দেহটার জন্যই সেদিন আমার চোখে বান ডেকেছিল। ঝড় থামলে গভীর রাতে একা এসে ঐ পাঠশালায় বসে সেদিন যে কান্না ওখানে কেঁদেছিলাম"—বলতে বলতে পণ্ডিত মশায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

"গ্রামের জমিদার পরদিন আশ্বাস দিয়ে বললেন 'দুঃখ করবেন না। কালই আপনার পাঠশালার নূতন চালা উঠবে।' কিন্তু তুই-ই বলতো—আমার সে কান্না শুধু চালাঘরের বাঁশদড়ির জন্যে?—সে কি ঐ ব্ল্যাকবোর্ডের সামান্য কাঠের জন্যে? জমিদারকে আমি কি বলে বোঝাই যে, এই চালাঘরে বসে পাঠ নিয়ে এই বোর্ডে আঁকাবাঁকা অক্ষর লিখে আমার কত ছাত্র দিক্‌পাল হয়েছে। আবার কত ছাত্র জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সকলের স্পর্শ ই যে আমি প্রত্যহ অনুভব করতাম এই চালাঘরে এসে, এইখানে বসে—এই সব জিনিস হাতে ছুঁয়ে।" আবার কয়েকটি নিস্তব্ধ

মুহূর্ত। মনে হল সেই স্পর্শ তিনি যেন তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয় নিয়ে অনুভব করছেন বলতে লাগলেন, "শিক্ষকতা করতে গিয়ে যা কিছু করেছি বা করতে হয়েছে, তাকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি। তোদের ভালবেসেছি বলে তোদের গড়ার আগে নিজেকে তৈরী করেছি—তোদের ভালবেসেছি বলে তোদের হাতের অক্ষর যাতে সুন্দর হয়, তার জন্য সুন্দর করতে চেষ্টা করেছি ব্ল্যাকবোর্ডকে—আমার নিজের অক্ষরকে। তোদের ভালবেসেছি বলেই নিজের হাতে গোবর-মাটি লেপে তোদের বসবার জায়গা সুন্দর করে রাখতে চেষ্টা করেছি। এমনি করে কখন যে আমার কাছে শিক্ষালয় আর দেবালয় এক হয়ে গেছে—সে ইতিহাস আমি জমিদারকে কি করে বোঝাই?"

হঠাৎ এক আগন্তুকের আগমনে তাঁর স্মৃতি-রোমন্থনে বাধা পড়ল। প্রণাম করে পথে নামলাম। চলতে চলতে মনে হল শিক্ষাপ্রণালীর দেহ আর আত্মাকে আজ যেন একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁর উদ্দেশ্যে আবার প্রণাম জানিয়ে বললাম, "হে আমার প্রথম পাঠের শিক্ষাগুরু। আমি বড় বড় উপাধি নিয়ে যা পাইনি, তুমি নিরুপাধি হয়েই তাই পেয়েছ। কারণ শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে আমি করেছি ব্যবসা—তুমি দিয়েছ ভালবাসা; আমি করেছি জীবিকা-অর্জন; তুমি করেছ জীবন-চারণ, আমার মন্ত্র তুচ্ছ জীবনধারণ, আর তোমার মন্ত্র জীবনের উর্দ্ধায়ন। তাই তুমি নিরুপাখ্য-নিরুপদ-নিরুপাধি—তুমিই শিক্ষা-প্রণালীর প্রাণমূর্তি।

শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যাসাগর

কালেভদ্রে এমন দু-একটি মনস্বীকে আমরা পাই যাঁরা একান্তভাবে আমাদের ঘরের মানুষ হয়েও মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত বর্তমানের সীমানা ছাড়িয়ে, সুদূর ভবিষ্যতের আকাশেও বিচরণ করে থাকেন। উপাধি দিয়ে উপমা দিয়ে এবং উপাখ্যান দিয়ে এঁদের আমাদের একজনা করে তুলতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত দেখি যে, আসলে এঁরা নিরুপাধি, নিরুপম ও নিরুপাখ্য। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এমনই একজন। উদাহরণ স্বরূপ তার মেধা, ছাত্র জীবনে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর অধ্যয়ন-তপস্যা, সে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ, কর্মজীবনে তাঁর টিকি, চাদর, চটির মহিমা ও গরিমা, সামাজিক জীবনে মধুসূদনীয় অপচয়ের প্রতিরোধে তাঁর বিদ্যাসাগরীয় অধ্যবসায়, বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তাঁর ঐরাবত-ভাসানো দুবার করুণা ধারা এবং পারিবারিক জীবনে তাঁর ভ্রাতৃপ্রীতি ও মাতৃভক্তির সঙ্গে তাঁকে কেন্দ্র করে বানানো ও ছড়ানো নানা শ্রদ্ধাপ্লুত কিংবদন্তীর কথাও ধরা যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালে সারা দেশে অনুষ্ঠিত ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণেও সেইসব কথা ও কাহিনী আর একবার নূতন করে বিভিন্ন বক্তার মুখে শ্রদ্ধাভরে সোচ্চার হয়ে উঠল। কিন্তু শিক্ষাসমস্যা-সংকুল বর্তমান কালের তটভূমিতে দাঁড়িয়েও, শিক্ষা-সংস্কারক বিদ্যাসাগর বোধ করি উপেক্ষিত থেকেই গেলেন অথচ একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, রামমোহন প্রবর্তিত আধুনিকতার সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র একটি বিশেষ নাম। কারণ রামমোহনের মত তিনিও কলিকাতাকেই কর্মকেন্দ্র করে পূর্বসূরী-প্রবর্তিত সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন এবং তার জন্য আমৃত্যু সুকঠোর সংগ্রাম করে গেছেন। অবশ্য একথা সত্যি যে, এ দুটি ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং বিদ্যাসাগর নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবেই তার সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন।

তথাপি আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শিক্ষা-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকেই প্রধানতঃ দেখতে চাই। এদিক থেকে তাঁর প্রথম পর্ব শুরু হয় শিক্ষক হিসাবে—ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে। মনে রাখা দরকার যে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য, সেকালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিখতে হত। শিক্ষাসংস্কারক বিদ্যাসাগর এই কলেজে পড়াতে

গিয়েই (১৮৪১--৪৬) বাংলা পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব বুঝতে পারলেন—বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষার সংস্কারেও যেমন, প্রসারেও তেমনি দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক চাই। সেই সঙ্গে এখানে অধ্যাপনা করতে গিয়েই প্রাচ্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সাগরের জলধারাও এসে তরঙ্গ তুলল। একটা ভারতীয় মহামনের সঙ্গে ইউরোপীয় মহামনের এই যে মিলন; সেটিই অতি অদূর ভবিষ্যতে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, দেশ দেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, বাংলা তথা ভারতবর্ষকে নূতন পথ দেখায়।

অতঃপর বিদ্যাসাগরকে আমরা পেলাম সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে (১৮৪৬-৫৮)। ছাত্র-জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত সংস্কৃত কলেজ এখন থেকে তাঁর কাছে একধারে জীবনচর্যা ও জীবিকা আহরণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। এই সুদীর্ঘ বার বছরের মধ্যে তাঁর ন' বছর কাটে অধ্যাপনা ও পরিচালনায়। এ বিষয়ে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন এবং সার্থকতা লাভ করেছিলেন, তা বোধ করি, যে কোন দেশের যে কোন শিক্ষক ও পরিচালকের গর্বের ও ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, এই সময়ের মধ্যেই তিনি এককভাবে চারটি শিক্ষাপরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছিলেন। শিক্ষা সংস্কারক বিদ্যসাগরকে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করতে হলে—এই পরিকল্পনাগুলিই বর্তমানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বে বলেছি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়াতে গিয়েই দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তকের অভাব তাঁর চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সু-সমৃদ্ধ ও ক্রমবর্ধমান ভাণ্ডার। সুতরাং বাইরে থেকে সে সমৃদ্ধির অর্জন ও তা দিয়ে ঘরকে যদি শ্রী-সম্পন্ন করতেই হয়, তাহলে চাই এমন এক যুবক সম্প্রদায় যাঁরা প্রাচ্য বিদ্যার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সমন্বয় ঘটাতে পারেন এবং সে সমন্বয়ের বাণী মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের ছাত্র সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি যে শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ করেন, তাতে এ কাজটারই গোড়া পত্তন হয়েছিল। এতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পথ-নির্দেশ করেছেন, কিভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা একাধারে সংস্কৃত ও ইংরেজিতে দক্ষ হতে পারে। উদ্দেশ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় সাধন এবং তাকে এই সব ছাত্র সম্প্রদায়ের মাধ্যমে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনূদিত বহু সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থকে প্রাথমিক দলিল হিসাবে ধরা যায়। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পথ ধরেই তিনি প্রয়োজন ও

প্রেয়কে এক সূত্রে বাঁধতে গিয়ে, "বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী" হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বার হয় কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সম্পাদক মোয়াট্ এবং তার সভাপতি বেথুনের অনুরোধে। এতে সংস্কৃত কলেজকে পঠন-পাঠন ও পরিচালনের দিক থেকে ঢেলে সাজাবার নির্দেশ আছে, বিশেষ করে ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরাজী পঠন-পাঠন সম্বন্ধে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণের মৌলিক বিষয়গুলি আয়ত্ত করে ছাত্ররা ক্রমে কঠিন সংস্কৃত গ্রন্থ পড়বে; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষা কিছু পরিমাণে অধিগত না হলে, ইংরাজী পড়া আরম্ভ করা উচিত হবে না; তৃতীয়তঃ, ইংরেজী শেখাকে ঐচ্ছিক পর্যায়ে না রেখে আবশ্যিক করতে হবে। বর্তমানের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা ত্রি-ভাষা সূত্র নিয়ে কোলাহল শুরু করেছেন, তাঁদের আজ একবার পিছন ফিরে শিক্ষাবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে অনুরোধ করি। সে যাই হোক, পরিশেষে তিনি লিখছেন যে, কাউন্সিল যদি তাঁর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন, তাহলে সংস্কৃত কলেজ শুধু যে সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চারই কেন্দ্র হবে তা নয়—অধিকন্তু এটি হয়ে উঠবে—"এ নার্সারী অব্ ইম্প্রুভড্ ভারনাকিউলার লিটারেচার এ্যাণ্ড অব্ টিচার্স থরোলী কোয়ালিফায়েড্ টু ডিসেমিনেট দ্যাট এ্যামঙ্গস্ট্ দি ম্যাসেস্ অব্ দেয়ার ফেলো কান্ট্রিমেন।" সংক্ষেপে একাধারে শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝতে হলে—এই রিপোর্টখানি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও একথা বলেছেন যে, বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে সংস্কৃত ও ইংরেজী শেখা অপরিহার্য। অতঃপর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীবিনয় ঘোষ-উদ্ধৃত ঈশ্বরচন্দ্রের "নোটস্ অন্ দি স্যানস্কৃট কলেজ"ও সেই এক সুরে বাঁধা। এখানে তাঁর বক্তব্য হল এই যে, সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ যদি করতেই হয়, তাহলে, এমন একদল ছাত্র গড়তে হবে, যাঁরা যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হবেন এবং সে ছাত্রদল সংস্কৃত কলেজ থেকেই বেরিয়ে আসবে যদি সেখানে পঠন-পাঠন, পাঠ্যসূচী ও ও পরিচালনা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের-মূলনীতি গুলিকে অনুসরণ করে চলে। এটি হল তাঁর তৃতীয় শিক্ষা প্রস্তাব। অবশ্য সব সময়েই যে কাউন্সিল অব্ এডুকেশন্ তাঁর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতেন তা নয়। তাই তাঁরা বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন্ সাহেবকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন। তবে সেই পরিদর্শন রিপোর্ট সমালোচনার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের হাতেই পৌঁছায়। এই বালেন্‌টাইন রিপোর্ট সমালোচনা করতে গিয়ে রামমোহন রায়ের মতই তিনিও বলে উঠলেন যে-বালেন্‌টাইন্‌-অনুমোদিত বিশপ বার্কলের "ইনকোয়ারি" কে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার কোনো অর্থ হয় না, যেমন হয়না সাংখ্য বেদান্তের মত ভ্রান্তদর্শনকে পাঠ্য করা। কর্তৃপক্ষের উচিত পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সপক্ষে রায় দেওয়া এবং তাকে এদেশে ছড়িয়ে দেওয়া। এই হল তাঁর চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত "কাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ" বিদ্যাসাগরের এই হল যথার্থ পরিচয়। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রের রচয়িতা রামমোহনের সার্থক উত্তরসূরী এই ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র একদিন বলেছিলেন যে, তিনি ছিলেন একাধারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, পণ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য। কিন্তু শিক্ষাপরিকল্পনাতেই তাঁর কর্তব্য তিনি শেষ করেন নি। সে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতেও তিনি যথাশক্তি প্রয়োগ করেছিমেন, একেবারে বনেদ থেকে। তাই দেখতে পাই যে, যখন বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব ইতিপূর্বে শিক্ষাপরিষদের সদস্য হিসাবে এ দেশীয় পাঠশালার উন্নতি বিধানে বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমতও জুড়ে দেন। সে অভিমতে এ দেশের পাঠশালাগুলিকে লেখাপড়া ও শুভঙ্করীর আর্য্যা কষার সীমানা পার করে দিয়ে, ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি শিক্ষার রাজপথে পৌঁছে দেবার নির্দেশ আছে। সেই সঙ্গে নির্দেশ, কিভাবে সংস্কৃত কলেজ বাংলা শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুল হিসাবে কাজ করবে। মনে রাখা দরকার যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থেকেও দক্ষিণ বাংলার পাঠশালাগুলির অবৈতনিক প্রধান পরিদর্শকের কাজও সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানেই নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক কালের প্রকৃত শিক্ষাবিদের মত, শিক্ষকতায় শিক্ষকশিক্ষণকে তিনি অপরিহার্য করতে চেয়েছিলেন।

পূর্বে বলেছি, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই দুটি ভাষাকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য তিনি এদেশে প্রবর্তিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। বীরসিংহ গ্রামে একটি ইঙ্গ-সংস্কৃত অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করেছিলেন। অতঃপর সে স্বপ্ন-সৌধের চূড়া

স্থাপিত হল ১৪৬৮ সালে মেট্রোপলিটান্ ইনস্টিটিউশনে। তৎকালিক বাঙ্গালী সমাজে এটা যে কত বড় কাজ, তা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই তুলে দিই—"সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিট্যুসান্। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশের ইংরাজীকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিলনা, তিনিই ইংরাজী বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।" কিন্তু কীর্তি তো তাঁর একটা নয়—অনেক. আসলে তিনি কীর্তিবাস। কি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তক, কি অনুবাদক, কি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ের প্রস্তাবকরূপে—সর্বত্রই তিনি কীর্তিমান্। কিন্তু নদী যেমন এক উৎস-পুষ্ট হয়েও, বিভিন্ন ধারায় বয়ে চলে, বিদ্যাসাগরও তেমনি স্বদেশ-মঙ্গল-চিন্তা পুষ্ট হয়ে বিভিন্ন দিকে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাপ্রসারকরূপটাই সবচেয়ে বেশী জীবন্ত এবং এটিই তাঁর চিরস্থায়ী রূপ। ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আইন করে, আন্দোলন করে সতীদাহ প্রথার বিলোপ এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন করা গেলেও তা হবে সাময়িক. যদি না দেশের স্ত্রী পুরুষ সুশিক্ষিত হয়ে স্বাধীনচিত্তে তা গ্রহণ করে। এইজন্যই অগ্রজরূপে তিনি যেমন সংকীর্ণ ব্রাহ্মণত্বের বেড়া ভেঙে স্বদেশকে হিন্দুত্বের প্রশস্ত তোরণে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছাত্রী সম্প্রদায়কেও সুশিক্ষিতা করতে চেয়েছিলেন। বেথুন কলেজের সম্পাদক এবং বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়ার বিভিন্নস্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগরকে মনে করলেই সেটি ধরা পড়ে।

কিন্তু এখানেই তিনি নিজেকে দায়মুক্ত মনে করেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে, এইসব বালিকা বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে চাই, উপযুক্ত মহিলা শিক্ষক। এ প্রসঙ্গে ব্রিষ্টলে রামমোহনের পরিচিতা মেরী কার্পেন্টারের নাম এদেশের নারী-শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এদেশে এসে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেথুন বিদ্যালয়ে নর্মাল

স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যখন তিনি করলেন, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিদ্যাসাগরও তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই একদিন লেখা হয়েছিল। কিন্তু এদিক থেকে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল—বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ। অবশ্য একথা ঠিক যে প্রথম ভাগে যথাক্রমে বর্ণানুক্রমিক, শব্দানুক্রমিক ও পরিশেষে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি গৃহীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও "স্বরবর্ণের সংস্কার সাধনে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শাস্ত্রসম্মত পৃথকীকরণে, হলন্ত ও আকারন্ত শব্দগুলির উচ্চারণ নির্ধারণে এবং ত কারের ত এবং ৎ এই দুইরূপ প্রদর্শনে" বিদ্যাসাগরের শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ মূর্তিটিই ফুটে উঠেছে। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে, প্রথমভাগে বাক্যগুলির বহর শিশুদের পক্ষে অনুপযুক্ত নয় এবং তার শব্দগুলিও শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে আহৃত। তৃতীয়তঃ, প্রথমভাগের দু একটি বাণীচিত্র শিশুকে কল্পনার অবারিত আকাশে নিয়ে না গেলেও তাকে অন্ততঃ মিলের তোরণে পৌঁছে দিতে পারে। যেমন, "পথ ছাড়, জল খাও, হাত ধর, বাড়ী যাও বা কাল পাথর, সাদা কাপড়" ইত্যাদি।

প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য যেমন অসংযুক্ত বর্ণ পরিচয় করানো, দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য তেমনি সংযুক্ত বর্ণ শেখানো। এর বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন—ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণ বিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাবিদের মত নীরস জিনিষের সরস পরিবেশন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই তিনি এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এদিক থেকে বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগে রবীন্দ্রনাথ প্রণীত সহজ পাঠ ১ম ও ২য় ভাগের সার্থক অগ্রদৌত্য সূচিত হয়েছে। অতঃপর সে পথকে আরও প্রশস্ত করতে তাকে একদিকে যেমন নানা ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করতে হয়েছে ও "শব্দমঞ্জরী" নামে বাংলা অভিধান রচনা করতে হয়েছে—তেমনি অন্যদিকে উপক্রমণিকা থেকে আরম্ভ করে, 'কুমার সম্ভব', 'কাদম্বরী' 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি গ্রন্থের দুরূহ সম্পাদনার পথেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই অর্থাৎ

প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। অবশ্য পৃথকভাবে শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ তিনি আমাদের জন্য রেখে যান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইগুলি থেকে এবং তাঁর জীবনব্যাপী শিক্ষা-সাধনা থেকে ও দুটো জিনিষ আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়। দার্শনিক বলে থাকেন, আমার কারবার জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম নিয়ে। শিক্ষাবিদ্ বিদ্যাসাগরের জীবন-দর্শনও এই রকম শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষালয় এই তিন নিয়ে গড়ে উঠেছিল এবং দার্শনিকের মত তিনিও বলতে পারেন যে, এই তিনের মধ্যে সমন্বয় আনাই ছিল তাঁর জীবন-সাধনা, শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর ব্রহ্ম। বস্তুতঃ সে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যই শিশুর কোলাহল মুখরিত পাঠশালা প্রাঙ্গণে বসে তিনি একদিকে যেমন বর্ণ পরিচয় লিখেছেন, মনীষা-দীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও তেমনি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। আবার শিক্ষার প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টাকে প্রতিষ্ঠানগত উদ্‌যোগের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন, ঢেলে দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় ও প্রশাসনে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ উদার দাক্ষিণ্যধারা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নিষ্ঠা থাকলেও শক্তি থাকেনা, সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না, থাকেনা তুঙ্গতা সত্ত্বেও পরিধি, কিন্তু বৈপরীত্য সমন্বয়কারী বিদ্যাসাগরের ব্যতিক্রম এইখানেই। তিনি একটি ব্যতিক্রান্ত মানুষ—একটি 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'। শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াসের মত যিনি একদিন দেশজোড়া 'অন্ধতামসী যামিনী'তে রাজশক্তির প্রাতিকূল্য মাথায় নিয়ে স্বদেশের শিক্ষাসমস্যাকে নিজের জীবনমরণ তপস্যা করে দুর্গমকে সুগম, দুরধ্যয়কে স্বধ্যয় এবং দুশ্চরকে সুকর করতে করতে স্বদেশের সকলকে আলোক-তীর্থ পথে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সেকালের সেই মহাশিক্ষককে যেন আমরা না ভুলি, যেন তাঁর অভ্যর্থনায় সক্রিয়তার শুভ শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে।

শিক্ষার অর্থনীতি

ফিলিপ্‌, এইচ্‌, কুম্বস্‌ তাঁর একখানি ক্ষুদ্র অথচ অধুনা-খ্যাত পুস্তক, "দি ওয়ার্লড এডুকেশন্যাল ক্রাইসিস্‌" এর একস্থানে লিখেছেন, এই যে বিশ্বজোড়া শিক্ষাসংকট, তার মূলে রয়েছে পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষাবিধি বা শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপরীত্য। অবশ্য এ ধরণের মন্তব্য কিছু নূতন নয়। কিন্তু এই বৈপরীত্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে যা তিনি ভেবেছেন, সেটি ভাববার মত। তাঁর মতে যুগে যুগে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচুর্য যদি কোথায়ও থাকে, তাহলে সেটি আছে ছাত্র-সংখ্যায়। অন্যদিকে উপযুক্ত অর্থ, শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণ—এক কথায় সব কিছুতেই এর দৈন্য-দশা। ফলে শিক্ষাসংকট কথাটা অজানা বা আগন্তুক নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে সে সংকট এত জটিল হয়ে উঠেছে যে, আজ তার আকৃতিটা সমাজের কোন স্তরেই অস্পষ্ট নয়। এ জটিলতার প্রথম কারণ, শিক্ষার প্রতি জনমানসের ব্যাপক, ব্যাকুল ও বেহিসাবী চাহিদা, দ্বিতীয়টি হল সে চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত "তন-মন-ধন"-এর অপ্রতুলতা; তৃতীয় কারণরূপে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থারই জড়তা। ফলে যেটুকু "তন-মন-ধন" যা হাতে আছে, তারও যথাযথ প্রয়োগ হয়না। কথাটা বেসুরো শোনালেও সত্যি যে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আবিষ্কর্ত্রী ও ধাত্রী, সেই ব্যবস্থাই তার নিজের বেলায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বিশ্বাস না হলে, সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষের একটি শিক্ষা সম্মেলনে ইউনেসকোর ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল ডাঃ ম্যালকলম্‌ এডিশেষিয়া তাঁর সমীক্ষার আলোকে যা তুলে ধরেছেন সেটি শুনে নিন। তাঁর মতে শুধু ভারতবর্ষে নয়, এমন কি সর্বোন্নত দেশেও শিক্ষা ব্যবস্থা তথাকথিত পরীক্ষা-সর্বস্ব। ফলে পরীক্ষা—বন্যার জল নেমে গেলেই যা পড়ে থাকে, সে পলিমাটিতে ছাত্র সমাজ না পারে দাঁড়াতে, না পারে নূতন কোন ফসল ফলিয়ে তার জাতি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করতে। জানি, বলবেন, এই যে শিক্ষা সম্বন্ধে এত গবেষণা হচ্ছে তার কি তাহলে কোন মূল্য নেই? অবশ্যই আছে, কিন্তু শিক্ষামূলক গবেষণা বলতে যা বোঝায় এবং এই সব গবেষণার মূল্য হিসাবে যেসব পি-এইচ-

ডি, ডি, ফিল্‌ বা ডি লিট্‌ উপাধি লাভ ঘটে, তার মোটা অংশটা হয় ঐতিহাসিক, আর না হয় ঐ সঙ্গে জোড়া দেওয়া এক ধরণের দীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধবিশেষ। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার আকৃতি ও প্রকৃতিতে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ হয়নি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার দৌলতে অর্থনীতি, সমাজনীতি—এক কথায় মানুষের পরিবেশ অতি দ্রুততালে পট পরিবর্তন করেছে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার স্থবিরতা ও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া-উদ্ভিন্ন পরিবেশ-জঙ্গমতার সংঘর্ষে পড়ে বিশ্ব-জোড়া শিক্ষা সংকট আজ সমাসন্ন। আর এই স্থবিরতার সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে তথাকথিত দেশাচার, ধর্ম-সংস্কার, সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ইত্যাদি। এখন ওই সংকট যদি কাটাতে হয়, তাহলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যবসারূপে গণ্য করে, একটা আন্তর্জাতিক বাজার তৈরী করতে হবে, যেখানে চলবে শিক্ষাজাত-দ্রব্য সম্ভারের অবাধ কেনা-বেচা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রুদ্ধ এবং রাজনৈতিক সম্বন্ধ তিক্ত হলেও যদি শিক্ষার আন্তর্জাতিক বাজার খোলা থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাসংকট তো দূর হবেই, সেই সঙ্গে আরও অনেক সংকট দূর হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ তাঁর মন্তব্য যে অমলক নয়, তার প্রমাণ মেলে বিগত বিশ্বযুদ্ধে। এই সময়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ রুদ্ধপ্রায় হলেও, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ অব্যাহতই ছিল। পক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি না করেও বলা যায় যে, ফল তাতে ভালই হয়েছিল। কারণ কোন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিশ্ব-শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গ বলে ধরলে, আন্তর্জাতিকতার আলো-হাওয়ায় সে অঙ্গ সচল ও সবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কথা যাক। পূর্বসূত্র ধরে বিচার করলে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে কুমব্সের মতে ব্যবসা হিসাবেই গণ্য করতে হবে। একি কথা শুনি আজ পণ্ডিতের মুখে! কিন্তু শুধু "পণ্ডিতের মুখে" নয়, পণ্ডিতদের মুখেও শুনলাম। আজীবন শিক্ষাব্রতী "শিক্ষক" সম্পাদকের মাধ্যমে এবার সেই শোনা কথাটা "শিক্ষক" পাঠকদেরও শুনিয়ে দিই।

এন. সি. ই. আর-টি'র নিমন্ত্রণে সম্প্রতি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি শিক্ষা-সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে বিশিষ্ট দু-চারজন বক্তার মুখেও শুনলাম যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে একটি বিশিষ্ট ও বৃহদায়তন শিল্প,

প্রতিষ্ঠান। এ শিল্পের অর্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বর্ণিত 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' নয়, একান্ত ভাবেই বেনিয়াবৃত্তিজাত শিল্প। প্রথমে ভেবেছিলাম, বক্তা বুঝিবা বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বেনিয়াবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন শুনলাম যে, কৃষিকার্য যেমন একটি শিল্প, তেমনি শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারটিও একটি শিল্প। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়, তার নিজ নিজ ছোট বড় জমিতে সেই মান্ধাতা আমলের সনাতনী প্রথায় ফসল ফলাতে গিয়ে যেমন বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে আসছে, তেমনি সারা জগৎ জুড়ে শিক্ষা ব্যবসায়েরও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ—এই তেতলা স্তরে বেহিসেবী পরিকল্পনা ও বেতালা মূলধন নিয়োগ করে আজ জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটিয়ে জাতীয় আয়ের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বক্তা তাঁর বক্তব্যকে সবাস্তব করবার জন্য উদাহরণ তুলে ধরলেন—এই যে শিক্ষাস্তরের ওপরতলা থেকে বার-হওয়া হাজার হাজার ইন্‌জিনীয়ার বেকার হয়ে বসে আছেন, তার কারণ কি? না, শিক্ষাকে এতদিন বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হয়নি শিক্ষারাজ্যে সুষ্ঠু অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়নি,—বণিকের শ্যেন ও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তার হিসাব-নিকাশ করা হয়নি। ফলে যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতিহীন কৃষি শিল্পে, তেমনি শিক্ষা শিল্পেও উন্নতি না হয়ে অবনতি ঘটেছে। ব্যবসায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ভাবের আগুনে কাজ হয় না—কাজ হয় অর্থনীতির সূক্ষ্ম জমা খরচে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষাবিদেরা একথা বুঝতে চাননি, বা এতদিন বোঝেন নি। সংক্ষেপে শিক্ষককে আজ বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকর্তার ভূমিকা নিতে হবে। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি স্থির করবেন কোন ব্যবসায়িক মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য কোন সামগ্রী, কি পরিমাণে কি গুণের তৈরী করতে হবে। তাকে ভাবতে হবে এর জন্য কি পরিমাণ কাঁচা মাল তাঁর হাতে আছে, কোন কোন যন্ত্রপাতি এবং কি ধরণের কারিগর বা শ্রমিক তাঁর চাই। শুধু তাই নয়, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির যথাযথ সংমিশ্রনে, সঠিক অনুপাতে ও তাদের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তাঁকেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুদীর্ঘ কাল ধরে শিক্ষকতা করতে করতে শুনে আসছি ও ভেবে আসছি

যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেবস্থান বিশেষ—শিক্ষককে সেখানে প্রবেশ করতে হয় অগ্নিশুদ্ধ পুরোহিত হয়ে। অবশ্য দক্ষিণান্ত করবার ব্যবস্থাও সেখানে থাকে এবং সেই সঙ্গে থাকে আনুষঙ্গিক অর্থনীতি। কিন্তু এহো বাহ্য। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দেখছি অতিদ্রুত তালে যেন সব গোত্রই পাল্টে যাচ্ছে বা গিয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা অর্থনীতির অনুপ্রবেষ্টা, তাঁরা শিক্ষক সম্প্রদায়কে শিক্ষাব্যবসায়ের সংগঠনকর্তা উপাধি দিয়ে বলছেন—এঁরাই শিক্ষার রাজ্যে নূতন পথের সন্ধানী, নূতন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা এবং উৎপাদন কাযের পথিকৃৎ। তাঁর বেনিয়া-দৃষ্টি-প্রদীপেই শিক্ষা ব্যবসায়ে ন্যূনতম ব্যয়ে সবচেয়ে বেশী মুনাকার গুপ্তধন আবিষ্কৃত হবে। অন্যথায় আসবে জাতীয় জীবনে বেকারত্ব, বিদ্রোহ এবং অনিশ্চয়তা।

বক্তা আরও এগিয়ে চললেন—বললেন, পূর্বেই বলেছি উৎপাদন-উপাদানের কথা। এখন দেখা যাক্ শিক্ষা-শিল্পে সেগুলি কি আকার নিয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মত অনেক শিক্ষকেরই ততক্ষণে বিকার এসে গেছে। কিন্তু বক্তা নির্বিকার। অর্থনীতির চিরাচরিত সেই তিনটি উপাদান—ভূমি, শ্রম ও মূলধন শিক্ষা-শিল্পায়তনে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমিকে আশ্রয় করে—তাতে যুক্ত হয়েছে শ্রমিকের শ্রম; আবার—এই দুয়েরই সংযোগে তৈরী হচ্ছে বাস্তব সামগ্রী। পরে এই বাস্তব সামগ্রীকেই উৎপাদন কার্যে লাগিয়ে মূলধন-তত্ত্ব তথ্যান্বিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু এই উৎপাদন উপাদানগুলির মধ্যে যদি গাঁটছড়া না বাঁধা হয়, তাহলে সব মাটি। তাই গাঁটছড়ার মন্ত্র পড়বার জন্যে ডাক পড়ে চতুর্থ উপাদান—সংগঠনকর্তার। এখন বুঝলাম শিক্ষায় অর্থনীতির অনুপ্রবেশে কিভাবে ছাত্র, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষালয়, এক কথায় শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারটি কত সহজে কাঁচামাল, শ্রমিক, সংগঠনকর্তা, মূলধন—সংক্ষেপে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। এবার বক্তা শেষ করলেন—তাঁর এন. এন. পি. ও জি. এন. পি'র সূক্ষ্ম আয় ব্যয় এবং লাভ লোকসানের খতিয়ান দাখিল করে।

তাহলে দেখা গেল যে, যে শিক্ষক-সম্প্রদায় এতদিন ধরে শিক্ষা নামে ব্যাপারটিকে বিশিষ্ট বাণিজ্য রূপে ধরবার কথা হতেই নাক সিঁটকাতেন, আজ তাঁদেরই একটা বড় অংশ—এ তথ্যকে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষায় অর্থনীতিকে গৌণ না করে তাকে এমন ভাবে মুখ্য করা হচ্ছে

যে, যেন অর্থনীতির সূত্রই এর সর্বস্ব। সারা বিশ্বজুড়ে আজ এ নিয়ে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে এবং তাকে রূপায়িতও করা হচ্ছে। এখন নামে কিছু আসে যায় কিনা বলা শক্ত। তবু গোলাপকে তো গোলাপ না বলে ডাকলে মন সাড়া দেয়না, যদিও জানি গন্ধ তার সমভাবেই বাতাসকে সুরভিত করবে। তাই শিক্ষাকে ব্যবসায় হিসাবে, বিদ্যালয়কে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসাবে—এবং শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিছক কারিগর বা শিল্পসংস্থার সংগঠক রূপে দেখতে যেন ইচ্ছে করে না। অথচ একথাও সত্য যে, দিনানুদৈনিক জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে গিয়ে আমরা পদে পদে হিসেব-নিকেশ করি, বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে পকেটের সঙ্গে প্যাকেটের সামঞ্জস্য করি এবং পরিশেষে কামনার সঙ্গে কাম্যদ্রব্যের একটা রফা করে ঘরে ফিরি। ঠিক সেই ভাবেই পাঁচটি ছেলে মেয়ে থাকলে আমরা ভাবতে বসি, কাকে কোন বিদ্যালয়ে, কোন ধরণের বিদ্যা আয়ত্ত করতে পাঠাব। এ হিসাব আমি করি কেন? আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায়।

এখন এই ব্যষ্টিগত হিসাবকে যদি সমষ্টিগত বা জাতিগত ভাবে প্রয়োগ করা যায়—সাদা কথায়, শিক্ষায় অর্থনীতির অনুপ্রবেশকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তাহলে দোষ কি? চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পযন্ত কি বিরাট অপচয়, অনুন্নয়ন ও অসামঞ্জস্য এসে বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা সংকটকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে। অর্থনীতির আঁক কষে তাকে যদি সরল ও সবল করা যায়, তাহলে তো সেটা ভাল ভাবেই গ্রহণ করা উচিত। জানি ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার সব সময়ে এক থাকেনা—কখনও তার গতি উর্ধ্বমুখী—কখনও বা নিম্নমুখী হয়। সুতরাং শিক্ষাশিল্পে আঁক কষে হিসেব করে চললেও, এর বিশেষজ্ঞকেও মাঝে মাঝে ওঠা-নামার নাগর দোলায় চাপতেই হবে। তবু যদি আগে থেকে বিনিয়োগ ও বিনিময়ের ব্যাপারটা শিক্ষার সকল স্তরে সাবধানে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ঐ নাগর দোলায় চেপেও হাত পা ভাঙ্গার সম্ভাবনাটা বোধ করি অনেকখানি কম থাকে। পণ্ডিত, তোমার প্রস্তাব এতদূর পর্যন্ত সাধু! কিন্তু ভগবানের দোহাই! শিক্ষায় তোমার এই অর্থনীতির অনুপ্রবেশকে (ইকনমিকস্ অফ্ এডুকেশন্) সর্বগ্রাসী করে তুলো না—করে তুলোনা বিদ্যালয়কে পাট বা লোহার গুদামঘর—বানিওনা শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিছক শ্রমিক বা বাণিজ্যিক শিল্প সংস্থার সংগঠক। তোমার দৃষ্টিতে শিক্ষা শিল্প-বিশেষ, আমার কাছেও তাই।

তবু বলব, তোমার কাছে শিক্ষা-শিল্প কেবল লাভ লোকসান ও জমা খরচের ব্যাপার,—অপর দিকে আমার কাছে সে-শিল্পের অর্থ জীবনের ঊর্ধ্বায়ন। তোমার শিল্পে লোকসান ঘটলে তুমি জীবন্মৃত হও—তোমার সম্পদের অপচয় হয়। কিন্তু আমার শিল্পে অপচয় ঘটলে সেই অপচয়ের বেদনা আমার কাছে সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। সে বেদনা-জাত সম্পদ নূতন বছরে, নূতন শিশু-সঙ্গমে পৌঁছে আমার মানসিক জন্মান্তর ঘটায়। তোমার চোখে ছাত্র-সম্প্রদায় প্রাণহীন পাটের গাঁঠবিশেষ। তাকে স্পর্শ করে তুমি হিসাব করতে বস—এর দাম কত, এবং শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হলে এর মুনাফা কত হবে। কিন্তু আমার কাছে ঐ সম্প্রদায় সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। তার সান্নিধ্য পেলে—তাকে স্পর্শ করলে, যে হিসাব আমার মনে জাগে তা কি তুমি আঁক কষে বার করতে পার? পণ্ডিত! তুমি অর্থনীতির সূত্র ধরে যত পার আঁক কষ—ছাত্রজন-সংখ্যাকে সুনিয়ন্ত্রিত কর—অপচয় রুদ্ধ কর—শিক্ষাক্ষেত্রকে শিল্পায়তন করে জাতীয় আয় বাড়াও,—আপত্তি করবনা বরং তোমাকে অভিনন্দিত করব। কিন্তু শিক্ষাকে শিল্পরূপে ধরে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রদত্ত শিল্পের সংজ্ঞাকে, একবারে নস্যাৎ করে দিওনা—দিওনা ছাত্র-শিক্ষকের হৃদয়-বিনিময়কে নিছক অর্থনীতির বিনিময় মূল্যে রূপান্তরিত করে দিতে। শিক্ষার অর্থনীতিকে রাখ আনুষঙ্গিক করে, কিন্তু অর্থনীতির অঙ্ককেই তার সর্বস্ব করো না।

শিক্ষাব্রতী লালা লাজপত রায়

ইংল্যাণ্ডের এডুকেশন বোর্ডের সভাপতিরূপে মনস্বী ফিশার একদিন বলেছিলেন যে, একটা জাতির মূলধনের হিসাব নিতে হলে, সেই দেশের মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির কথাটাই আগে ধরতে হয়। লালা লাজপত রায়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে আজ আমার ঐ কথাটাই বেশী করে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এই কারণে যে, একটা প্রাগ্রসর স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোধা হিসাবে ফিশার যা ভেবেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র শহর জাগারণে বসে শিক্ষাব্রতী লালাজীও একদিন সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। ফলে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনায় আজ তাঁকে নতুনভাবে স্মরণ করবার দিন এসেছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, তার রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি ও দীপ্তি খুব বেশী, এবং তাকে স্মরণ করতে গেলে, "লাল-বাল-পাল" এই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিটাই বেশী করে মনে আসে। বিশেষ করে সুরাট কংগ্রেসের সভাপতির পদ স্বেচ্ছায় ও হাসিমুখে পরিত্যাগ করায় সারা ভারতবর্ষ আজও তাঁকে স্বদেশপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহরূপে পূজা করে। সরকারের নানাবিধ অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর নির্যাতন ও নির্বাসন প্রভৃতির কথা মনে রাখলে শিক্ষাব্রতী লালাজীকে বিস্মৃত না হওয়াই বিস্ময়কর। কিন্তু এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও তিনি সমান অগ্রণী ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগে খুব সম্ভবতঃ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেই তিনি প্রথম প্রবেশ করেন। তিনি নিজে বলেছেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেহলী পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিক্ষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অতঃপর সে ধারা আর শুকিয়ে যায়নি বরং উত্তোরত্তর বেড়ে চলেছিল। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এ ধারণা দৃঢ় হতে লাগল যে, ভারতের রাষ্ট্রিক মুক্তি-জাহ্নবীর পথ সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই খোলা হতে পারে। এবং এই পথ নির্মাণের জন্য তিনি আজীবন ভগীরথের মতন তপস্যা করে গেছেন। কিন্তু সে কথার যাথার্থ্য বুঝতে হলে

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাঞ্জাবের দিকে একবার চোখ ফেরানো দরকার।

১৮৪৯ সাল। সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসির ভারতবর্ষ। ঐ সালে পাঞ্জাব ইংরেজ-সাম্রাজ্য ভুক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরোধবিন্দুও মিলিয়ে গেল। আর পঞ্চনদীর দেশে জীবন-স্পন্দনও যেন সহসা থেমে গেল। তারপর একে যাদুদণ্ডস্পর্শে সঞ্জীবিত করলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—১৮৮৩)। প্রতিষ্ঠিত হল পাঞ্জাবের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ—আর্য সমাজ ও শুদ্ধি-আন্দোলন; প্রকাশিত হল "সত্যার্থ প্রকাশ।" হ'ল পাঞ্জাবের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। সৌভাগ্যক্রমে দয়ানন্দ শিষ্যরূপে পেলেন লালা হংসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত এবং লালা লাজপত রায়—এই তিন বন্ধু এবং আরও অনেক জ্ঞানী-গুণীকে। এই ত্রয়ীকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, এক কথায়, আপামর সাধারণ যেন সহসা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। হংসরাজ দিলেন ভাব, গুরুদত্ত উৎসাহ এবং তাকে রূপায়িত করতে লাগলেন লালাজী।

অতঃপর ঐ তিন বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ (১লা জুন—১৮৮৬)। পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক জাগরণে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐ তিন বন্ধুর দানের কথা চিন্তা করলে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—আবার নতুন ভাবে "পঞ্চ নদীর ঘিরি দশ তীর" এল কি "সে একদিন?" হ্যাঁ, সত্যই তাই, এবং এই জাগরণের সঙ্গে অক্সফোর্ডের "রোমানিষ্ট রিভাইভ্যাল্"-এর তুলনাও করা যেতে পারে। কিন্তু লাহোর তথা সমগ্র পাঞ্জাবের সেই পরমাশ্চর্য চিত্তোদ্‌বোধনের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস এ প্রবন্ধের এলাকার বাইরে। তবু যে তার একটু আভাস দিলাম, তার কারণ হল এই যে, শিক্ষাব্রতী লাজপত রায়কে বুঝতে হলে ঐ পটভূমিকার সঙ্গে তার যোগসূত্রটিও ধরা চাই। এ থেকে বোঝা যাবে যে, জীবনের ঐতিহাসিক তোরণদ্বারে লাজপত রায় প্রথমে শিক্ষাব্রতী হিসাবেই প্রবেশ করেছিলেন।

এবার পূর্বোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষাব্রতী লালাজীর সম্পর্ক তাঁর নিজের কথা থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। তিনি নিজে লিখেছেন, সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে ঐ প্রতিষ্ঠান আমার জীবনের সমগ্র অংশ জুড়ে ছিল। এবং আমার যা কিছু অর্থ সামর্থ্য সব ওখানেই উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু

কেন এই সর্বস্ব সমর্পণ? তার উত্তরে মাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ঐটিকে তিনি জাতীয় শিক্ষা প্রসারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। এবং যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রচার ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে পারে, সেই হেতু পরবর্তীকালে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করেও ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি সারাজীবন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ ছিলেন। আমরা পরে দেখব যে, এর প্রশাসন, পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান প্রণালী ছাত্রদের দৈহিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর মতো তিনি যেমন চিন্তা করেছেন, তেমনি তাদের রূপায়ণের জন্যও তিনি চেষ্টার ক্রটি করেন নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়রেখায় জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনও বার বার দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও নাগপুর কংগ্রেসের (১৯২০) প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের যে দুই মহা তরঙ্গ আসে, তা সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম তরঙ্গ মিলিয়ে গেল, ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লাগায় তার দ্বিতীয় তরঙ্গ বিলুপ্ত হল, অসহযোগ আন্দোলন থেকে মহাত্মাজীর আত্মসংহরণের ফলে। কিন্তু এ থেকে দুটি পরম লাভ হল। প্রথমতঃ এই আন্দোলনের ফলেই সারা ভারতবর্ষে জাতীয় বিদ্যালয় থেকে শুরু করে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাদের ব্যর্থ পরিণতি সত্ত্বেও মনে রাখা উচিত যে, এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারেই জাতীয় শিক্ষার মূল সূত্রগুলি একদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ডি, এ, ভি, কলেজ ও তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লালাজী এ ব্যাপারে একক হয়ে আছে। কারণ প্রথমতঃ, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গ ভঙ্গ বা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতে যাঁরা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন লালাজী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

চলেছি।শু একথা সত্য যে, সত্যকার জাতীয় বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়, তা ভারতের রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি-প্রাপ্ত বাংলার জাতীয় বিদ্যালয়েই প্রথম শুরু দিয়েছে কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, যে-সব শিক্ষক সেদিন জীবন পন করে ভগীরথে ভি, কলেজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদানের মধ্যে

দেশাত্মবোধই তখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে, সে সব ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা দোষ-দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদেরই উদার অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাছাড়া এটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে বোধহয় একমাত্র ডি, এ, ভি, কলেজকেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অতঃপর জাতীয় ভাবধারাকে সামনে রেখে যে পাঠ্যসূচী প্রণীত হলো তাতে রইলো, (১) হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার, (২) স্বাধীন সংস্কৃতির ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন, (৩) ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং (৪) কার্যকরী ও ব্যবসাকরী শিক্ষার প্রসার। বলা বাহুল্য যে, এর প্রতিটি বিষয়েই লালাজীর দান অপরিমেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষা-চিন্তায় তিনি স্বাজাতিকতা ও সার্বজাতিকতার মধ্যে একটা সমন্বয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তীকালে মহাত্মাজীও শিক্ষাবিদ্‌রূপে ঐ আদর্শ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিহাস-আহৃত শিক্ষা হল এই যে, নিরবচ্ছিন্নভাবে সদরকে আঁকড়ে থাকলে, অন্দর হারিয়ে যায় আবার অন্দরে বসে থাকলে সদর সুদূর হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও বুঝেছিলেন যে, স্বজাতির মধ্য দিয়েই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়েই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়; বুঝেছিলেন যে, "আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাইতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা, তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ঘর ও পরকে সমন্বয়-সূত্রে বিধৃত করেই তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাছাড়া ঐ প্রতিষ্ঠানের নামকরণেও সে সমন্বয়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। কিন্তু এ পথ সহজ নয়—বন্ধুর। রবীন্দ্রনাথ কোন স্থানে বলেছেন যে, বাতাসে যে সত্য ভেসে বেড়ায় তাকে স্বীকার করে নেয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা নিষ্প্রতিভ, তারা অনাগত কালের সে শুভ পদধ্বনি শুনতে পায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে, "নিষ্প্রতিভের" সংখ্যা কোন দেশেই কোন কালেই কম থাকে না। পাঞ্জাবেও ছিল না। কিন্তু নিষ্প্রতিভদের নিদারুণ বাধা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় শিক্ষার পথকেই প্রশস্ত করতে লাগলেন।

নাগপুরে (১৯২০) "নিখিল ভারত ছাত্র মহাসমিতির" প্রথম অধিবেশনে

সভাপতি লালাজীর ভাষণের এক অংশ এখন তুলে দেওয়া দরকার। কারণ, জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এখানে দ্ব্যর্থহীন হয়ে উঠেছে।—"বাল্যকাল হইতেই আমার ধারণা, বিদেশী সরকারের অধীনে কোন শিক্ষা-প্রণালীই দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হইতে পারে না। প্রত্যেক সরকারই সর্বাগ্রে নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং নিজের স্বার্থরক্ষা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া থাকে। বিদেশী সরকারের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য শাসিতদের উপকার ততটা নয়, যতটা শাসকগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভারত সরকার স্কুল কলেজে যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করিতেছেন আমার মতে তাহা ভারতীয় জাতির পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। এই শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য আমাদের মুক্তি সাধন নয়, ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করা।

"এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের শিক্ষার ফলে আমরা মনে করিতাম, ভারতীয় যাহা কিছু আছে, সবই মন্দ। আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে, ভারতীয় অধিকাংশ জিনিষই বর্বরতামূলক, সুতরাং ঘৃণার পাত্র। ফলে আমরাও বিদেশী অশন, বিদেশী বসনের অনুকরণ করিয়া দেশের যাবতীয় জিনিষকেই ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতাম। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন সে সময় অতীত হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার আর এক বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত। এখন কেহ কেহ মনে করেন, ভারতীয় যাহা কিছু আছে, সবই সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু আমি ইঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারি না। আমার ধারণা, সত্য চিরকালই সত্য, জ্ঞান চিরকালই জ্ঞান, বিজ্ঞান চিরকালই বিজ্ঞান। ইহারা প্রাচ্যও নহে পাশ্চাত্ত্যও নহে, ভারতীয়ও নহে, য়ুরোপীয়ও নহে, ইহারা যাহা ঠিক তাহাই। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এ কথাটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। শিক্ষা ব্যাপারে আমাদিগকে পূর্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইবে। জাতি হিসাবে আমরা য়ুরোপীয়ও হইতে চাহি না, আমেরিকানও হইতে চাহি না, আমরা ভারতীয়ই থাকিতে চাহি। তবে আমাদিগকে বর্তমান যুগের কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়া চলিবে না। আমরা যদি পাশ্চাত্ত্য জগতের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিই, আমাদের পক্ষে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার মত হইবে মাত্র। বর্তমানে যাহা ভাল, তাহা লইয়া আমাদের অতীতের ভিত্তির উপর শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেখানে যাহা ভাল, সমস্তই আমাদের গ্রহণ করিতে

হইবে। ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি ধর্মবিরোধের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার বহু ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্ত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে এবং যে ভাবেই হউক সে স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইবে।" এ প্রসঙ্গে মহীয়সী মহিলা এ্যানী বেশান্তের উক্তিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর মতে জাতীয় চরিত্রে বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী ভাবধারার অনুপ্রবেশ জাতীয়তার শনি-স্বরূপ। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও বার বার এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধা বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজী কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল্ ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল্ ইকনমি। যাহা কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে, সেই পড়া আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি 'পোলিটিকাল সভ্যতা' ছাড়া সভ্যতার আর কোন আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতি মাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্‌গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্র-সম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিত সাধন করিতে ব্যগ্র।

"মানুষ যদি এমন করিয়া নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে, তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল।" কিন্তু সে কি সহজ গান—বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষে? সে গানের জন্য দরকার শিক্ষকের প্রাণ এবং প্রাণের ছোঁওয়া-লাগা পাঠদান প্রণালী. সে প্রণালীতে ছাত্র কথা বলবে কিন্তু বুলি আওড়াবে না। বলা বাহুল্য প্রকৃত শিক্ষাবিদের মত লালাজী এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত "মাষ্টার মশায়"-এর স্থানে "গুরু"-কেই বসাতে চেয়েছিলেন। সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, যে-

পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে "প্রণালীর বটিকা" না গিলিয়ে, শিক্ষক তার "চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত" করেন, লালাজী তাকেই অভিনন্দিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকারী স্কুলের উর্দু ভাষার শিক্ষক তাঁর পিতা লালা রাধাকিষণ নিজেই ছিলেন এমনই এক জাত-শিক্ষক। সুতরাং লালাজী-ঈপ্সিত শিক্ষাদান পদ্ধতির স্বরূপ জানতে হলে পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন যে, তার পিতার মতো শিক্ষক তিনি খুব কমই দেখেছেন। শিক্ষকতার ভূমিকায় তিনি কখনও উপদেষ্টা হয়ে অবতীর্ণ হতেন না—অবতীর্ণ হতেন শুশ্রূষু হয়ে। ফলে তার শিক্ষা-প্রণালীর মূলমন্ত্র ছিল ভালবাসা। অন্যদিকে শিশুর প্রতি সম্ভ্রম বোধও তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল দেবমন্দির, শিক্ষক, পূজারী এবং শিশু ছিল সে মন্দিরের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রস্তর-বিগ্রহকে ভক্তি করলেই কর্তব্য শেষ হয়, কিন্তু জীবন্ত বিগ্রহ নিয়ে যাঁদের কারবার, ভক্তির সঙ্গে ভালবাসাকেও তাঁদের পূজার উপকরণ করতে হয়—এই ছিল লালাজীর ধারণা।

অন্য দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্থান নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, মানব জীবনের অর্থ যদি চলা হয়, তাহলে যেখানেই সে জীবন আছে সেখানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সে-চলাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলতে হবে। ভারতবর্ষ আজ কলে-হাতিয়ারে, গ্রামে-শহরে, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে গড়া এক বিরাট দেশ—সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে স্থান নির্বাচনের প্রশ্ন অবান্তর। বস্তুতঃ জীবন-সংগ্রামে যাদের নামতে হবে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষা দেওয়া ফলপ্রসূ হবে না বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পলায়নী বৃত্তির একান্ত বিরোধী। তাছাড়া শহর থেকে দূরে পাঠিয়ে শিক্ষা দিতে গেলে যে, অনেক পিতা মাতাকে অর্থের অভাবে ছেলে মেয়েদের নিরক্ষর রাখতে হবে খুব সম্ভবত এ ভাবনাও তাঁর মাথায় ছিল। মোট কথা, যে-পরিবেশে শিশুকে একদিন নাগরিক হয়ে বসবাস করতে হবে, তিনি সেখানে রেখেই তাকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার বয়ঃসন্ধিকালের যেসব সমস্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়, তার সমাধানের জন্য, দেহ চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শিক্ষাদানের কথাও তিনি বিশেষ করে ভেবেছিলেন এবং তাকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই

কারুশিল্প ও চারুশিল্প তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় হাত মিলিয়েছিল। অতঃপর সব চেয়ে জটিল প্রশ্ন সহশিক্ষার ব্যাপারে তিনি বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ-পন্থী। তিনি বলেছেন যে বালক-বালিকাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে শিক্ষা দিলে, তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সামাজিকতাবোধ গড়ে ওঠে না।

এবার দেখা যাক, জাতীয় শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি? তিনি বলেছেন যে, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা অবশ্যই বাহন হবে। এছাড়া সর্ব-ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী থাকবে, এবং হিন্দুমুসলমান অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যথাক্রমে দেবনাগরী ও উর্দু অক্ষর দিয়ে চালু করা হবে। কিন্তু সে জাতীয় শিক্ষা যাতে সংকীর্ণ না হয়ে পড়ে, যাতে তার মধ্যে বিশ্বের আলো-হাওয়া প্রবেশ করতে পারে এবং যাতে শিক্ষার্থী বাহিরে অর্জন করে ঘরে সঞ্চয় করবার শক্তি পায় সে দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তাঁর মতে ইংরেজী শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তার চাপে শিশুমন যেন নীরস না হয়ে ওঠে, এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরকে আট বৎসরে বিস্তৃত করে তার শেষ তিন বৎসরের জন্য ইংরেজীকে অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে তিনি রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্য অপেক্ষা তার ভাষাজ্ঞানের উপরই তিনি জোর দিতে চেয়েছেন। এই ভাবে দেখা যায় যে, জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ করতে গিয়ে, তিনি তার সব দিকের কথাই ভেবেছেন। এবং এতে যে তিনি বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছিলেন ও তাঁর উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যে একটা গভীর সামঞ্জস্য ছিল, সেটি বুঝতে পারা যায়, লালাজীর সাধের জাতীয় বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের উৎসবে মহাত্মাজীর উপস্থিতি থেকে। ১৯২১ সাল ৯ই নভেম্বর। লাহোরের জাতীয় কলেজের "এই জাতীয় যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং মাহাত্মা গান্ধী এবং লালালাজপত রায় এই যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক।" তাছাড়া ছিলেন, মতিলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ, শোভানী, লালা হংসরাজ প্রভৃতি দিকপালেরা। সুতরাং এ অনুমান অমূলক নয় যে, লালাজী-প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁদের সানন্দ সায় ছিল। এতে লালাজী যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার সার্থক অগ্রদূত হিসাবেই লালাজীকে আমরা আর একবার দেখতে পাই। এ ভাষণে ফুটে উঠে ভারতের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-জোড়া পটভূমিকা—ধরা পড়ে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে লালাজী ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় শিক্ষার মধ্যেই আছে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—রাষ্ট্রিক মুক্তি,

সামাজিক মুক্তি, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি চিন্তার মুক্তি। বস্তুতঃ চিন্তার স্বাধীনতা না এলে, বাইরের দেওয়া বা পাওয়া কোন স্বাধীনতাই যে রক্ষা করতে পারা যায় না—একথা পরবর্তীকালের অন্যান্য শিক্ষাবিদের মত লালাজীও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি চিন্তার স্বাধীনতাকে আনতে চেয়েছিলেম। আযৌবন শিক্ষা প্রচারে ব্রতী লালাজীর কণ্ঠে সেই স্বাধীনতার কথাই এই উপাধি বিতরণ উৎসবে আবার মুখর হয়ে উঠল। তিনি ঘোষণা করলেন, "জাতীয় শিক্ষায় আর কিছু শিক্ষা হউক আর না হউক, ...অন্ততঃ তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রগণ যেন না বুঝিয়া কেবল পাশের জন্য মুখস্থ না করে; তৃতীয়তঃ তাহাদের আদর্শের প্রতিকূল কোন শিক্ষাই যেন তাহাদিগকে না দেওয়া হয়!" সঙ্গে সঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠল ছাত্রদের কণ্ঠে—"আমি পবিত্রভাবে শপথ করিতেছি, চিরজীবন স্বদেশ ও স্বধর্মের সেবা করিব, স্বদেশ ও স্বধর্মের বিরুদ্ধজনক কোন কাজই করিব না।" এবার পেলেন তাঁরা মহাত্মাজীর আশীর্বাদপূত উপাধিপত্র। লালাজীর এই ভাষণ ও ছাত্রদের এই শপথ গ্রহণেই কি জাতীয় শিক্ষার ধ্যান-মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়নি? সংকীর্ণতা-বিবিক্ত স্বদেশ ও স্বধর্মের সেবাই কি জাতীয় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য নয়? বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকতা বোধ-উন্মেষে শিক্ষার স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণন কমিশন্ এবং মুদালিয়র কমিশন্ও কি সেই কথাই বলেন নি? কালের ব্যবধানে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় লালাজীর মত ও পথের সঙ্গে আমাদের মত ও পথের হয়ত বা মিল না হতেও পারে, এবং সেক্ষেত্রে হয়তো নূতন করে পথ ও মত দুইই গড়ে নিতে হবে; কিন্তু যখন ভাবি দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাৎকালিক শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করে গেছেন—অতীতের ভিত্তির উপর সাত-মহলা প্রাসাদ গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করে গেছেন এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মধ্যমণি করেছেন তখন তাঁকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম পথিকৃৎ না ভেবে পারি না। তিনি যে যুগে এসেছিলেন সেটি পরাধীনতার যুগ—ব্যর্থতার যুগ। তিনি নিজেই বলেছেন, আমাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়নি জানি। কিন্তু সে ব্যর্থতার অভিভবে এই বলিষ্ঠ আশাবাদীর মানসিক বিভব কখনও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়নি। স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় কি এই বলিষ্ঠ আশাই প্রেরণা দিচ্ছে না? আর তা যদি হয়ে

থাকে, তাহ'লে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শিক্ষাব্রতী লালাজীকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে, প্রথমতঃ এই ভেবে যে, জাতীয় শিক্ষার রূপ একদিন যাঁদের মানসনেত্রে ফুটে উঠেছিল, এবং "বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ দহন" তুচ্ছ করে যাঁরা একে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, লালাজী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান ভারতের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় যাতে অতীত ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্যও তাঁকে আজ নতুনভাবে স্মরণ করবার দিন এসেছে। সুতরাং তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় দুই-ই।

আন্তর্জাতিক সমাজ বন্ধন ও শিক্ষক-শিক্ষণ

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার দিক থেকে দেশবিদেশের নানা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্থা বহুদিন থেকে কাজ করে এলেও, অতীত ইতিহাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বার বার দেখিয়ে দিয়েছে যে, ঐ সব সংস্থার ভিত সবল নয়। কারণ এই বোঝাপড়ার গোড়ার কথা যে মানসিকতার পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন আনা এবং তাকে স্থায়ী করা, কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চুক্তিতে হয় না। আর যদি বা হয়, তাহলেও তার মেয়াদ বেশীদিন টেকে না। তাই দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রে কালি শুকাতে না শুকাতেই আবার রণ-দামামা বেজে ওঠে। আসলে চুক্তিপত্রগুলো ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিমাত্র, স্বার্থ-সংঘাতের হাওয়া লাগলেই, তা জলে ওঠে। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহের অপসারণ ও শান্তির পুনর্বাসনে চাই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন এবং সে পরিবর্তন আনতে ও তাকে স্থায়ী করতে পারে একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা—যার সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মানসিকতার। বস্তুতঃ যুদ্ধের মূল রয়েছে—তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক—মানুষের মনে, এবং এই অসুস্থ মনকে সুস্থ ও সবল করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। তা যদি হয়, তাহলে সমগ্র শিক্ষক সমাজকেই আজ একাজে এগিয়ে আসতে হবে। ফলে যে সব শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে এই শিক্ষক-সমাজ গড়ে উঠেছে, সেই সব শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক সমাজ-বন্ধনের ভূমিকায় একাধারে কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির উৎস বলে ধরা উচিত। কারণ, এখানেই সংহত হচ্ছে সেই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপ্রণালী, যা দিয়ে ভাবীকালের মানুষের মন তৈরী হবে। এখানে একদল দেয় ও অপরদল নেয় এবং সেই দেওয়া-নেওয়া নিছক গুরু-শিষ্য সংবাদে আবদ্ধ না থাকে, কালক্রমে দেশবিদেশের বৃহত্তর সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য একথা সত্য যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই একদল শিক্ষক সমাজ-শিরোমণি তাঁদের ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ দিয়ে দেশ-বিদেশের সমাজ-বন্ধনকে সুদৃঢ় করে আসছেন। কিন্তু পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে, সারা বিশ্ব মরণান্তিক দুঃখ পেয়ে একথা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করেছে যে, সংস্কৃতি-বিধ্বস্ত বিশ্বে সাংস্কৃতিক

পুনর্বাসনের জন্য, শিক্ষক সমাজের দ্বারস্থ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অপরদিকে শিক্ষক-সমাজ আজ এ বিষয়ে অবহিত যে, ব্যক্তিগত বা একক প্রচেষ্টার তুচ্ছতা বা পরিধি যাই হোক না কেন—আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ও প্রতিষ্ঠানগত চেষ্টাও একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং শিক্ষক তৈরির কাজে ব্যস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির ওপর এই ভার স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছে। বলা বাহুল্য এ দায় গুরু দায়—বিশেষতঃ এই অতি-দ্রুত পরিবর্তমান বিস্ফোরণ-ধর্মী সমাজে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে— সাধারণতঃ তিন দিক থেকে। প্রথমতঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের ফলে, মানুষ আজ আর শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করে বা সাক্ষরতা অর্জন করেই দিন কাটাতে চায় না—কারণ জেট্ প্লেনের যুগে বাস করে কোন্ মূর্খ গো-যানে অভিযান করবে? দ্বিতীয়তঃ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ "তরুণ গরুড় সম"। সে আজ দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তৃতীয়তঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্‌বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছে জন-সংখ্যার বিষম চাপ।

সত্যি বলতে কি, জনসংখ্যার এই আধিক্যই সর্বপ্রকার ব্যবস্থাকে, বিশেষ করে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিপুল জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক পুনর্বাসন করা এক অতি-বৃহৎ রাজসূয় যজ্ঞ বিশেষ। কিন্তু তার যাজ্ঞিক শিক্ষণ-শিক্ষালয় থেকেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেরিয়ে আসবে বলে আমাদের ধারণা।

মহাত্মাজী একবার যেন কোথায় বলেছিলেন, মন্দির গড়বার আগে পূজারী ঠিক করে রাখ। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির আসল ভূমিকাই হল, পূজারী প্রস্তুত করা। এই পূজারী বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে ছাত্রদের শুধু বর্ণপরিচয় করিয়েই ক্ষান্ত থাকবেন না, পরন্তু বর্ণ-বৈষম্যের বিষময় ফল সম্বন্ধেও অবহতি করাবেন—শুধু ব্যাকরণই পড়াবেন না, সমাজ-প্রকরণও পড়তে শেখাবেন—শুধু বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানেই দিনাতিপাত করবেন না, অধিকন্তু যে আলয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রী পুত্র বা কন্যা হিসাবে মাতাপিতার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে না—সেই গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি চলে যাবেন ঘরের মানুষের মত সমস্যার দূরীকরণে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীকে কেন্দ্র করে যে পিতামাতার মধ্যে দাম্পত্য জীবনেও সমস্যার জট পাকাচ্ছে—তার জট ছাড়াতেও এই পূজারীর আজ প্রয়োজন। এ থেকে

বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষক সম্প্রদায় আজ ক্রমশঃ সমাজ-কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, এই সমাজ-কর্মীর ভূমিকা অন্যান্য সমাজ-কর্মীর ভূমিকা থেকে বহুলাংশে পৃথক। এক হিসাবে এঁর মূল্য একজন বাস্ চালক—ঝাড়ুদার বা ঐ শ্রেণীর কর্মী থেকে এক কানাকড়িও বেশী নয়। কারণ এঁরাও সকলেই সমাজকর্মী এবং সমাজ-বন্ধনকে এঁরাও ধরে রাখছেন। কিন্তু অন্য দিক থেকে, শিক্ষকেব কাছে আশা করা হচ্ছে একটু উঁচুস্তরের নৈতিক মানদণ্ড। তাছাড়া, উচ্চতর শিক্ষা-শিক্ষণ-দক্ষতা তো চাই-ই। সংক্ষেপে বিত্ত-কৌলিন্য তাঁর থাকুক বা নাই থাকুক—কৃষ্টি-কৌলিন্য অপরিহার্য। কিন্তু প্রথমটির অভাবে দ্বিতীয়টি যে কিভাবে লাঞ্ছিত হয়, দিনের পর দিন—ঘরে ও বাইরে—সে খবর তো সমাজ রাখতে চায় না! অবশ্য সমাজ সে খবর রাখুক আর নাই রাখুক, শিক্ষক সমাজকে এই মূলধন নিয়েই জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সমাজ-বন্ধনের কাজে নামতে হবে, এবং সে মূলধন সে সংগ্রহ করবে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় থেকেই। কারণ এখানেই সে আনুষ্ঠানিকভাবে শিখবে আন্তর্জাতিক সমাজ-বন্ধনের মূলতত্ত্বগুলি, শিখবে প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী ও দৈনন্দিন জীবন-চর্যার ভিতর দিয়ে এবং সেগুলিই সে প্রয়োগ করবে—নিজ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায়। সত্যি বলতে কি, চোখ কান খোলা রাখলে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তা ও সার্বজাতিকতার বোধোদয় নানাভাবে ঘটাতে পারা যায়। স্থানাভাবে এখানে মাত্র ইতিহাস-শিক্ষকের কথাই বিশেষভাবে বলতে চাই। কারণ, অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় বোধ হয় ইতিহাস-শিক্ষকই ছাত্রদের মনে একটা মোহমুক্ত দৃগ্ভঙ্গী গড়ে তোলবার বেশী সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই শিক্ষক কোন ইতিহাস পড়াবেন? অতীত ইতিহাসের রাজবৃত্ত ব্যাখ্যা, না তার লোকবৃত্ত ব্যাখ্যা—রাজ-রাজড়ার স্বার্থ-সংঘাতের ইতিহাস, না জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস—সমগ্র বিশ্ব-সমাজকে প্রভাবান্বিত করে ইতিহাসের উদার উন্মুক্ত ধারা, না বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রভান্বিত করে ইতিহাসের শতধা সংকীর্ণ শীর্ণ ধারা? অতীতের নজিরে দেখা যায় যে, ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে, সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি, বর্তমানকালেও তার দোসর হয়েছে বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদ-পত্র প্রভৃতির সোচ্চার ঘোষণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়া, জার্মানী এবং ইতালী প্রভৃতি দেশের প্রচার-বিভাগের কার্যাবলী মনে রাখলেই, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষেও সেই একই নীতি অনুসৃত। প্রমাণ

ইস্কুল-কলেজ-পাঠ্য ইতিহাস-পুস্তকগুলি। এগুলির লেখক—শাসক বা শাসিত যে কোন সম্প্রদায়ের হোন্ না কেন—তারস্বরে গেয়ে চলেছেন ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রশস্তি—যেন হিন্দু-মুসলমান-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে গৌরব করার মত কিছুই ছিল না! অবশ্য সেক্ষেত্রে দু-একজন লেখকের "স্বর্ণমুষ্টি" যে ঝরে পড়েনি তা নয়। কিন্তু সেটি ব্যতিক্রম মাত্র। আবার বর্তমানকালেও যে সমস্ত ইস্কুল-পাঠ্য ইতিহাস রচিত হচ্ছে, তাতেও দেখতে পাচ্ছি বিশেষ বিশেষ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ কথা। কিন্তু ইতিহাস প্রাদেশিকতার বা সাম্প্রদায়িকতার উপাসক নয়; তার উপাস্য সার্বদেশিকতা—সার্বজনীনতা—এক অখণ্ড মানব সমাজের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা"র কাহিনী। তথাপি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, বর্তমান যুগে যখন ভৌগোলিক দূরত্ব ঘটানো বাধ্যতা-মূলকভাবে মুছে যাচ্ছে—যখন এক দেশ অন্য দেশের উপর ভরসা রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তখনও ইতিহাস গ্রন্থে সেই জাতিগত, দেশগত ও সম্প্রদায়গত সীমানার নিশানা থেকে তুলে মানুষের সেই অখণ্ড ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। অথচ আজ একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, হয় আমাদের একসঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, নয় পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আমাদের মুছে যেতে হবে। ছাত্রদের প্রথম থেকে একথাটাই বোঝানো দরকার। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষক যেমন একদিকে নিজেকে নূতন আলোকে শিক্ষিত করে তুলবেন, তেমনি তাঁরাই আবার নূতন করে ইস্কুল-পাঠ্য ইতিহাস রচনা করতে বসবেন। এই নূতন গ্রন্থে রাজবৃত্ত ইতিহাস অবশ্যই থাকবে—কিন্তু সেটা থাকবে মাত্র কাঠামো স্বরূপে। অন্যদিকে সে কাঠামো সুডৌল সৌষ্ঠবমণ্ডিত হবে লোকবৃত্ত ইতিহাস দিয়ে—অর্থাৎ অখণ্ড মানব-জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা-বাহিকতাই হবে সে ইহিাসের প্রাণ।

অতঃপর আসে শিক্ষণ প্রণালীর কথা। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজ বন্ধনের কথাটা শুধু বিদ্যালয়েই নয়, আপামর জনসাধারণের মধ্যেও আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু যে কথাটা আরও বেশী সোচ্চার হওয়া উচিত, তা হ'ল, জাতীয় বন্ধন বা জাতীয় সংহতির প্রশ্ন। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে যে সত্যরূপে পাওয়া যায়"—এই সত্যটাই আমরা না পারছি বুঝতে—না পারছি বোঝাতে। ইতিহাসের এটাই হল প্রথম পাঠ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে "ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত

আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া, ক্রমে দেশেরই বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে। ফলে, সেটি স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করেনা—দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র।” এই আবৃত দৃষ্টি নিয়ে আর যাই হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে বিজাতির, দেশের সঙ্গে বিদেশের সহমর্মিতা গড়ে উঠতে পারে না। আর তা যদি শিশুকাল থেকে গড়ে ওঠবার সুযোগ না পায়, তাহলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ‘দূর অস্ত’ই থেকে যায়। সুমার্জিত যৌথ পরিবারে বাস করে, সন্তানসন্ততিরা যেমন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিখতে থাকে যে, তারা সকলেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অংশীদার, তেমনি বিদ্যালয়ে বসে ইতিহাস শিক্ষকেরও এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, যাতে ছাত্রেরা বুঝতে পারে যে, এক দেশকে অভুক্ত, অসুস্থ ও নিরক্ষরতার অন্ধকারে রেখে, তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা, জীবনকে ভোগ করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তোলা নৈতিক অপরাধ। আশার কথা এই যে, এই উপলব্ধি আজ ক্রমশঃ ব্যাপক হচ্ছে। ইউনেস্‌কো, এন. ই. এফ. থেকে আরম্ভ করে আই. এ. টি. ই প্রভৃতি ছোট বড় প্রতিষ্ঠানগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হচ্ছে—তা হ’ল এই যে, “আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।”

আমি পথিক, পথ আমার সাথী

না, সে বছরে নয়, মাত্র সেদিন, "করিলাম মন," উঁহু, "শ্রীবৃন্দাবন" নয়, চিদাম্বরম্ "বারেক আসিব" ঘুরি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এত জায়গা থাকতে চিদাম্বরম্ কেন? সত্যি বলতে কি, এ "কেনো'র সঠিক কোনো উত্তর নেই। তবে এটা ঠিক যে, বহুপূর্বে পড়া এর পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর স্মৃতি আমার মনে জমা ছিল। ফলে হঠাৎ একটা সুযোগ এসে পড়ায়, আমার "যাত্রা হল সুরু"। অতঃপর গিরি-দরি-অরণ্যানী সমন্বিত ভারতবর্ষের যে দিকটি বহুবার দেখেও আমার "নয়ন না তিরপিত ভেল"—তাকেই "চোখের আলোয়", "চোখের বাহিরে" দেখতে দেখতে অবশেষে এসে পৌঁছালাম তামিলনাড়ুর অন্তর্গত চিদাম্বরমে। পুরাণ বলে, নটরাজ তাঁর নৃত্য-শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখাবার জন্য এই স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তাঁর নৃত্যের তালে তাল দেখবার উপযুক্ত স্থানই বটে! চতুর্দিকে ওষধি থেকে আরম্ভ করে বনস্পতি পর্যন্ত সকলেই সেখানে নটরাজের নৃত্যমঞ্চ সজ্জায় অংশীদার। সেইসঙ্গে আছে নারিকেল শ্রেণীর অসংখ্য ঝালর। মাথার উপরে নিঃসীম আকাশে নীল চন্দ্রাতপ কখনও রৌদ্র-স্নাত, আবার কখনও বা নক্ষত্র-খচিত। কিন্তু চিদাম্বরম্ এই দুই রূপের কোনরূপেই আমাকে প্রথম দেখা দেয়নি। কারণ আমি সেখানে পৌঁছেছিলাম নিশীথে, রাত্রির নিবিড়তায়। তার ওপর টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ায় সেই রাতে আমার প্রত্যাশিত সঙ্গী আমাকে ট্রেনের কামরা থেকে টেনে বার করে যখন স্বল্প ছাউনী-ঘেরা গো-যানে তুললেন তখন মনে হল, এক অন্ধতামসী যামিনীতে মাত্র আমরা দুজনেই ঘর ছেড়ে পথে বার হয়েছি। কিন্তু পথ যে হারাই নি, তার প্রমাণ মিলল পরের দিন অনেকখানি বেলায়, যখন ঘুম ভাঙ্গলো। অতঃপর প্রাতঃকৃত্যাদির পালা শেষ হ'লে, বন্ধুর সঙ্গে বার হলাম চিদাম্বরম্‌কে কেন্দ্র করে তারই গড়ে-ওঠা চেট্টিনাদ-রাজ প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। যেটা সবচেয়ে ভাল লাগল, সেটা তার বড় বড় বিল্ডিং নয়—তার শান্ত সমাহিত রূপ। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ও ছাত্র-সমাজ উভয়েই এই রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অতন্দ্র প্রহরীস্বরূপ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আজকের দিনে

এটি কম কথা নয়, কারণ পূর্বে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন প্রবেশ করলে মনে হতো বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছি, আজ সেখানে গেলে রাজনীতির নামাবলীটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে। এর সঙ্গে আরও ভাল লাগল অধ্যাপক ও ছাত্র সমাজের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা। এঁদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, এঁরাও শঙ্কিত এই ভেবে যে, হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে এর বহিরঙ্গে চলবে পোষ্টারের ছয়লাপ, অন্তরঙ্গে ঘটবে দক্ষযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি। আবহাওয়া লঘু করবার জন্য বললাম, এখনও বেশ কিছুদিন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ঐ তো চোখের সামনে দেখছি এখনও পাকা রাস্তায় মোটর বাসের পাশাপাশি গরুরগাড়ী করে জনসাধারণ যাতায়াত করছে। মানুষ-টানা রিকসায় এঁরা ওঠেন না, এমন কি কিছুদিন আগে এ যান চালু করবার প্রস্তাব উঠলে এঁরা যে জান্ পযন্ত দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, তাও শুনেছি। সুতরাং মাভৈঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কুৎসিত রাজনীতির পথ-রোধ করে দাঁড়াবার জন্য প্রাণ দেবার লোকেরও অভাব হবে না। কিন্তু আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে আসিনি,—আমি এসেছি চিদাম্বরমের নটরাজকে দেখতে। সুতরাং পায়ের উপর ভরসা করে চলে এলাম চিদাম্বরমে।

চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরকে কেন্দ্র করে চারদিকে চারটি সুবৃহৎ মন্দির গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা এই মন্দিরগুলি চোল রাজাদের স্থাপত্য-কীর্তির অমর নিদর্শন। এর প্রাণহীন প্রস্তর গাত্রে খোদিত রয়েছে প্রাণময় আনন্দময় নটরাজের একশ আট ভঙ্গীর নৃত্যকলা। পণ্ডিতেরা মনে করেন ভরত-নাট্যশাস্ত্র সম্মত এই ভঙ্গীগুলি নৃত্য-শিল্পীদের জীবন-বেদ স্বরূপ। সে যাই হোক্ মন্দির গাত্রে খোদিত এই নৃত্য সভায় একদিকে যেমন মুগ্ধ দর্শক আছেন, তেমনি আছেন অসংখ্য যন্ত্রী। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই দেবলোকের অধিবাসী। তবু গর্ব হয় এই ভেবে যে, যাঁরা এর স্থপতি, তাঁরা সবাই এই মরলোকের অধিবাসী—এবং ভারতবাসী। আমি নৃত্য-শিল্পী নই, এবং সে শিল্পের সূক্ষ্ম কলা-কৌশলও বুঝিনা। তবু নৃত্যের দেবতাকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম, মন্দিরগাত্রে এই যে, "সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি," এই যে "কোপপ্রেমগর্ব-সৌভাগ্য স্ফুরিতাধরা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা স্ত্রীমূর্তি"—এ কি হিন্দুর কীর্তি? বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করে, মনে মনে বললাম, হিন্দুকুলে জন্মলাভ করে জন্ম সার্থক করেছি!

অতঃপর মন্দিরগাত্র থেকে মন্দিরাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, অন্ধভক্তের দল নটরাজের স্বর্ণমূর্তি গড়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটি বিশেষ মন্দিরে।

এখানে তিনি বিত্ত-কুলীন। অবশ্য অন্য তিনটি মন্দিরে তিনি স্বভাব-কুলীন হয়েই বিরাজমান। তবে বিত্ত-বিলাসী নটরাজ মন্দিরেই ভিড় বেশী। হবে না কেন? সামনে স্বর্ণস্তম্ভ, বিগ্রহ-কক্ষে স্বর্ণ ছাদ, বিগ্রহ অঙ্গে স্বর্ণাভরণ, আরও কত কি? স্তম্ভে হাত রাখতেই সঙ্গী বলে উঠলেন—হ্যাঁ, মশাই, গিণ্টি নয়—আসল সোনা! আবার রথ যাত্রার সময়ে যদি থাকেন, তো দেখবেন নটরাজের ঐশ্বর্য। তবে দক্ষিণভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিত্তকুলীন দেবতাকে দেখতে চান, তো চলে যান তিরুপতি! তিরুপতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভক্ত সঙ্গীটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চললেন, জানেন ওখানকার একমাসে দর্শনী বাবদ যা জমা হয়, তাই দিয়ে একটা রাজ্য চলতে পারে? আর এর সঙ্গে তিরুপতির কাছে মানৎ করা দক্ষিণ ভারতীয়দের নিবিড় কালো কুঞ্চিত কেশদাম কর্তিত হয়ে যে বিদেশী মুদ্রা আনে, তার হিসেব আপনার নাগালের বাইরে। হায় তিরুপতি! কালের পরিবর্তনে তোমারও কি সৌন্দর্যবোধ লুপ্ত হয়ে গেল! সৌন্দর্যকে কদর্য করতে, শ্রীকে কুশ্রী করতে তোমার বিবেক বাধল না? তোমার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আকুল-কুন্তলাকে মুণ্ডিত-মস্তকা হতে দেখে, মানুষ আমি, আমারও চোখ ফেটে জল এসেছে—কিন্তু হে তিরুপতি! দেবতার দেবতা! তোমার চোখের কোণে এক ফোঁটাও জল দেখিনি! আমার কাছে কোন সাড়াশব্দ বা উৎসাহ না পেয়ে বন্ধুটি বোধ হয় বিমর্ষ, হয়তো বা বিরক্তও হয়েছিলেন। বললেন, চলুন, ফেরা যাক—বেলা অনেক হয়েছে। আবার সেই গো-যান, সেই ধীরে ধীরে পথ চলা। রৌদ্রকরোজ্জ্বল চিদাম্বরমের নারিকেল কুঞ্জকে বড় ম্লান—বড় করুণ মনে হল। পিছনে ফেলে আসা নটরাজের মন্দির চূড়ায় দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম সেখানেও ক্লান্ত মধ্যাহ্নের করুণ কান্না। নাঃ দেবতা নিষ্ঠুর নন, না নটরাজ—না তিরুপতি। মানুষই তার অন্ধভক্তির ধূপদীপে দেবতার মাধুর্য-মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঐখানেই কদর্যতা।

পরের দিন সকাল বেলা। অঝোর ঝরায় বৃষ্টি পড়ছে। দিক্‌হস্তীর মত কালো মেঘ সারা আকাশে মদমত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। তবে কি আজ প্রাণহীন গার্হস্থ্যাভিসারেই দিন কেটে যাবে? কিন্তু দিন যে আমার হাতে

বেশী নেই—সব দিক থেকেই যে পাততাড়ি গোটাবার পালা এল! সুতরাং ঐ অবস্থাতেই বেড়িয়ে পড়লাম। গৃহস্বামী চোখ কপালে তুলে হাঁ, হাঁ করে উঠলেন—"এই দুর্যোগে?" চলতে চলতে বললাম—"এ দুর্যোগ কাটবার আশায় বসে থাকলে হয়তো এ জীবনে আর সুযোগই হবে না"। "কিন্তু আমি তো আজ আপনার সঙ্গী হতে পারছিনা—অথচ আপনি আমার অতিথি—এ অবস্থায় একা আপনাকে, মানে গৃহিনীই বা কি বলবেন?" ভদ্রলোককে বাঁচাবার জন্য হেসে বললাম, এ অবস্থায় আমি একা একা ব্যবস্থা না করে নিলে, আপনারা এমন দিনে দোকা থাকতে পারছেন না! আচ্ছা, চলি, নমস্কার—আগামী কাল সকালে ফিরব"।

বাড়ী থেকে বার হবার সময়েই ভেবেছিলাম আর কোথাও নাহোক, অন্ততঃ "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তির" সমাধিতে একবার নতি জানাইতেই হবে। আর যেতে হবে 'অরো-ভিলা'য়, যেখানে সমগ্র বিশ্বের মাটি মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসে মাটির মানুষেরা "মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত"—সৌধ রচনা করেছেন।

সুতরাং আন্নামালাই নগর থেকে পদযাত্রা, পরে চিদাম্বরম্ ষ্টেশন এবং টিকিট কেটে কিছুক্ষণের মধ্যেই সশরীরে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। ইতিমধ্যে মৃদঙ্গ-মুখর আকাশ স্তব্ধ হয়েছে—দিক্‌হস্তীর দল স্বস্থানে ফিরে গেছে। সমুদ্র-বিধৌত আশ্রম মিষ্টি রোদে আরও মিষ্টি হয়েছে। সমুদ্রতীর বরাবর রাস্তা ধরে যেতে যেতে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথকে; মনে পড়ল, "গগন নহিলে ধরিবে কে বা!"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, রবীন্দ্রের জন্য যেমন উন্মুক্ত গগন, তেমনি অরবিন্দ-শ্রীকে ধারণ করতে হলেও চাই উদার সমুদ্র বক্ষ। বড়র জন্য বড় পরিবেশই প্রশস্ত। এ যোগাযোগ আকস্মিক তো নয়ই, বরং একাধারে ঐতিহাসিক, আত্মিক ও ঐশ্বরিক। না হলে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে এসে শান্তিনিকেতনের ছাতিম-তলাকে মনে পড়বে কেন! "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার"—কাব্যিক উচ্ছ্বাস নয়, এ ঐতিহাসিক সত্য—আত্মিক সত্য।

পূর্বেও আশ্রমে এসেছি—আজও এলাম। দেখলাম সেই সমাদর, সেই আপ্যায়ন—সমাগত বহুভাষী বিভিন্ন ধর্মীর প্রতি আশ্রম কর্মীদের সেই আন্তরিক আতিথেয়তা। মহামায়ার অদৃশ্য ইঙ্গিতে চলে বিশ্ব-সংসার। শ্রীঅরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সংসার আশ্রমটিও চলছে অদৃষ্ট মাদারের সুস্পষ্ট নির্দেশে।

রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর, রোগীর ঘর থেকে পূজার ঘর, পাঠশালা থেকে গোশালা—সব জায়গাতেই আশ্রম কর্মীরা যেন মঙ্গলময়ী, মাতৃ-প্রদত্ত একটি মাত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, এক পরম লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে, নীরবে, নির্বিরোধে এবং নির্দ্বিধায় কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ এঁরা ভিন্নভাষী, ভিন্নধর্মী ও ভিন্নদেশী। তবে কি মাদার যাদুমন্ত্রে এঁদের সম্মোহিত করে চালাচ্ছেন। আশ্রম-আত্মা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন; সম্মোহিত করে নয় কর্মীদের সম্যকরূপে অবহিত করে, নিজেকে এবং অপরকে বাঁচাবার বিশল্যকরণী রোপন করে, কর্মব্রতীর ব্রাত্যতা শিখিয়ে, বিশ্বানুভূতির সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে আত্মিক যোগের দ্বারা মানুষের দ্বৈপায়নত্ব ঘুচিয়ে!

বিদেহী আশ্রম-আত্মা এবং দেহী আশ্রম-আত্মা এবং দেহী আশ্রম-মাতার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে আবার পথে নামলাম। এবার দেহ-এনজিন্ বললে, কয়লা জল না দিলে আর গাড়ী ছাড়ছি না, অতএব ঢুকলাম মন্দ্রদেশীয় এক ভদ্র রেঁস্তোরায়। ঝাল তেঁতুল সহযোগে বিচিত্র ব্যঞ্জনের ভয়ে ভাত না চেয়ে বললাম, "ধোসা হবে? কফি?" মালিক মাথা নাড়লেন। কিন্তু ভরসা পেলাম না। কারণ দক্ষিণ ভারতে দু-তিনবার গিয়েও ও-দেশের মাথা নাড়াটা কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর টিকিট চাওয়া কনডাকটারের কাছে টিকিট-না-থাকা এবং টিকিট-না-দেওয়ার মতলবে থাকা ভদ্র আরোহীর মত। ওটা হাঁ ও না দুই-ই হতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ধোঁসা এসে গেল, সঙ্গে কফিও। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে ধোসা গরমও বটে। খান দুই ধোসা ধ্বংস করে দেখতে পেলাম, আমারই টেবিলে আমারই সামনে এক ভদ্রলোক আহার পর্ব প্রায় শেষ করে এনেছেন। তাজ্জব কাণ্ড! এতক্ষণ এ ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি! খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখা আর কাকে বলে? ছিঃ ছিঃ, এতক্ষণ ধরে খিদের চোটে ধোসার ওপর ভদ্রলোকের সামনেই বসে যে কালাপাহাড়ী চোট লাগিয়েছি—তা ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা পেল। সেটা কাটাবার জন্যই যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে আসছেন? উত্তর এল "মাইশোর"। ক্রমে আলাপের সুর নিবিড় হলে জানতে পারলাম ভদ্রলোক এক হিসাবে আমার স্বজাতি, সমধর্মী, সহকর্মী এবং সহমর্মীও বটেন। এবং আমারই মত ঝড়বাদল উপেক্ষা করে—পঁদিচেরি আশ্রম দেখতে এসেছেন জিজ্ঞাসা করলাম, 'অরোভিলা' দেখবেন না? আবার উত্তর এল, নিশ্চয়ই। তবে ভাবছি যাব কি করে? ও রাস্তায় তো এখন কোন বাস্ চলে না, ট্যাক্সিও

হয়তো যাবে না। তাছাড়া আজ সকালের এত বৃষ্টি! আচ্ছা, চলুন, এখানকার গভর্ণরকে বলে একটি জীপের ব্যবস্থা করতে পারি কি না। নাঃ এতক্ষণে বুঝলাম পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ইতস্ততঃ করছি, ভদ্রলোক উঠে পড়ে হাতে টান দিয়ে বল্‌লেন, "আইয়ে দোস্ত আইয়ে, মাৎ ঘাবড়াইয়ে।" দোকানের মধ্যে নাটক না করে তার পিছুই ধরলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভর্ণর সাহেবের কুঠি এবং বিরাট ফটকে বিরাট বন্দুকধারী প্রহরী দেখে বুঝলাম এটা রাজপ্রাসাদই বটে! দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি। কিন্তু রেঁস্তোরায় হাঠাৎ পাওয়া অধ্যাপক কঙ্কণওয়াড়ি একটা কাগজে কি লিখে প্রহরীর হাতে দিতেই রাজপ্রহরীর কয়েক মিনিটের জন্য অন্তর্ধান ঘটল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে অধ্যাপককে সাদর সম্ভাষণ জানাতেই দেখি, তিনি পিছন দিকে আমার অনুসন্ধান করছেন।

যাক, বাঁচা গেল। অধ্যাপক যে পাগল নন অন্ততঃ এ পর্যন্ত নিশ্চিত হলাম। দোতলার বারান্দায় উঠতেই এখানকার গভর্ণর শ্রী বি. ভি. জাত্তি অধ্যাপককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং আমার সঙ্গে স্মিতহাস্যে করমর্দন করতেও ভুললেন না। শ্রীজাত্তি বলে চললেন—"আমরা সতীর্থ বাল্যবন্ধু।" সবিনয়ে বললাম, "সেটা তো বুঝতে পেরেছিই, উপরন্তু এটাও জানলাম যে, সে বন্ধুত্ব আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন।" এবার চোখ পড়ল তাঁর সামনের টেবিলে। না, লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইলের স্তূপ নয়—খোলা পুস্তকের স্তূপ। যে স্তূপে বিগত মনীষীদের অনেক জিজ্ঞাসা অনেক উত্তর নির্বাক বিস্ময়ে চোখ মেলে আছে বুঝলাম, শ্রীজাত্তির চোখ এতক্ষণ সেখানেই নিবদ্ধ ছিল। দেখে দেখে ভাল লাগল, কারণ একাধারে গভর্ণরী ও লেখাপড়ি, শাসন ও পঠন বড় একটা শোনা যায় না।

ইতিমধ্যে রাজদর্শনের প্রথম বিস্ময়, শঙ্কাও বটে, কাটিয়ে আশ্রয় পেয়েছি দক্ষিণ ভারতীয় সফেন কফির পেয়ালায়। বিশ্বভারতী থেকে আসছি শুনে, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে শ্রীজাত্তি বলতে লাগলেন, "ভারতবর্ষে বর্তমানে চারটি সার্বজাতিক আশ্রম আছে। বহিরঙ্গে এগুলির বিচিত্রতা যাই হোক না কেন, আমার ধারণা অন্তরঙ্গে সেগুলি একই। গুরুদেব, স্বামীজী, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মাজী-স্মৃতিপূত এই সব আশ্রম দর্শন করাই একটা মহা সৌভাগ্যের কথা! আপনার সৌভাগ্য আরও বেশী, আপনি বিশ্বভারতীয় কর্মী ও অধিবাসী"। মিথ্যা বলব না, সত্যই নিজেকে সেই মুহূর্তে অনেকের চেয়ে

বড় বলে মনে হল। কিন্তু নিজেকে মনে মনে যাচাই করবার সময় পেলাম না। শ্রীজাতি বলে চলেছেন, "কিন্তু কথা কি জানেন—বর্তমানে আমরা না ঘাটকা-না-ঘরকা, না স্বজাতিক না সার্বজাতিক। বিশেষ করে স্বাধীনতা পাবার পর থেকে দিনের পর দিন যেন বেশী করে অনুভব করছি যে, আমাদের জাতীয় ভাষা নেই, ভূষা নেই, জাতীয় খাদ্য নেই, পানীয় নেই—নেই জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা। বর্তমানে আমাদের সবটাই যেন ধার করা! সরকার সোচ্চারে ঘোষণা করছেন জাতীয় সংহতির কথা—সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমাকেও সেকথা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, অথচ চোখে দেখছি যে, সংহতি আনলো অসংগতি, ভাষা হল সর্বনাশা, জাতীয়তা দিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা। ফলে আন্তর্জাতিকতা, সার্বজাতিকতা ইত্যাদি শব্দগুলো শুধু শব্দ করেই থেমে যাচ্ছে। আচ্ছা, বলুন তো, জাতীয় না হয়ে কি আন্তর্জাতিক হওয়া যায়? বনস্পতিকেও যে সামান্য কঞ্চির বেড়া আশ্রয় করে বাড়তে হয়।" বাধা দিয়ে বললাম, "ক্ষমা করবেন, আপনার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেও শিক্ষাপ্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলতে আপনি কি বলতে চান জানি না—এবং এর অনেকখানি অংশও যে ধার-করা সম্পত্তি—যেমন ধরুন, বিজ্ঞানের দিক, কারিগরি বিদ্যার দিক—তাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার মনে হয় ধার করাতে বা ধার নেওয়াতে দোষ নেই। আসল কথা হল, তার প্রয়োগ ও ব্যবহার, তা থেকে ফসল ফলানো। সেটি যদি জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী না হয়, তাহলে তাকে জাতীয় শিক্ষা বলেই ধরব। এসেই নজরে পড়েছে আপনি রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত হিন্দুশাস্ত্র সংকলন পড়ছিলেন। এ কথাটা আপনার অজানা নয় যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বলে চতুর্বর্গ ফলের কথা আছে। যদি মনস্তাত্ত্বিকতা ধরে অগ্রসর হই, তাহলে দেখি যে, মানুষের মধ্যে কামনা (ডিজায়ার) আছে এবং তা পূরণের জন্য সে মাধ্যম (অর্থ) খোঁজে। এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যুগে যুগে ভারতীয় মনীষীরা কামনার মাধ্যম খুঁজতে গিয়ে তাকে ধর্মান্বিত করেছেন। সে ধর্ম এক কথায় বলতে হলে, বলবো মানব-কল্যাণ। একাধারে দেশকালব্যাপী ও দেশকালাতিশায়ী—এই দিক থেকে ভারত মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেছে। সে মুক্তি পারলৌকিক কিনা জানিনা—তবে সেটি যে ভারতবর্ষকে চিত্ত-দৈন্য থেকে মুক্ত করেছে, তা বোধ করি সত্য। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান

বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তির বন্যা নেমে গেলে বিদেশাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান স্বদেশগত হবে —তা হবে জাতীয়। কিন্তু আর না, অনেকক্ষণ সময় নিয়েছি, এবার উঠতে হবে।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চোখে পড়ল একখানি বিশেষ ধরণের ভেলভেট্ মোড়া চেয়ার ; অথচ অব্যবহৃত বলে মনে হল। গভর্ণর সাহেবও সঙ্গে এসেছিলেন বিদায় দিতে। আমার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে বললেন—"এই সেই আসন, যার ওপর বসে ডুপ্লে একদিন সমগ্র ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু ইতিহাসের আকস্মিক অট্টহাস্যে যে স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন হল! সেই সঙ্গে বৃটিশ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ডরূপে"।

রাজ প্রাসাদের ফটক পার হতেই দেখি জীপ্ দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে কখন যে কঙ্কনওয়াড়ি করিতকর্মা ব্যক্তির মত সব ঠিক করে রেখেছেন বুঝতেই পারিনি। গাড়ী ছেড়েছে,—গুন্ গুন্ করে গান এসেছে গলায়, মন বলছে, চল অরোভিলায়, চল তীর্থ যাত্রায়! আশ্রম থেকে প্রায় বার তেরো মাইল দূরে অবস্থিত অরোভিলায় যখন এসে পৌছালাম, তখন "অতি দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে।" চতুর্দিকে সীমাহীন প্রান্তরের নীরব নিস্তব্ধতা। আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ধ্যানলীনা দিগ্‌বধু, পূর্বঘাট পর্বতমালাকে গলার মালা করে অস্তগিরির চরণতলে প্রণাম জানাচ্ছে। কিন্তু হায়! আমার প্রণাম কি কোনদিন এত দূর থেকে এত সুদূরে পৌছাবে? তবু সেই সন্ধ্যায়, সেই মহাপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে, সমগ্র বিশ্ব-আহৃত পূত-পবিত্র মৃত্তিকা দিয়ে গড়া বিশ্ব-নাগরিকতার বীজস্বরূপ সেই আন্তর্জাতিক প্রস্তরস্তম্ভে মাথা ঠেকিয়ে, আমার যেন জন্মান্তর ঘটে গেল। মনে হল রক্তরাঙ্গা গোধূলির আলোকের পথ বেয়ে "জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি"। আমি উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত অতিক্রান্ত সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করছি অন্তরে এবং বাহিরে। মনে হল আমারই সন্নিকটে দাঁড়িয়ে এক মহামৌন স্থপতি এই অরোভিলায় বিশ্বসভ্যতার এক নূতন ভিত্তি স্থাপন করছেন।

কুলায় ফিরে আসা পাখীর কল-কাকলীতে উৎকর্ণ হয়ে পিছন ফিরতেই দেখি, সেই স্তম্ভের অদূরে এক বিরাট বটবৃক্ষ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। চমৎকার সংযোগ! বিশ্ব সভ্যতার প্রতীক প্রস্তর স্তম্ভ—ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক বোধিদ্রুম! স্বজাতিকতা ও সার্বজাতিকতার এক অপূর্ব সমন্বয়। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, পঁদিচেরী গভর্ণরের সঙ্গে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা নিয়ে

বৃথাই দুজনে কথা কাটাকাটি করেছি। ঐ তো সামনে রয়েছে আমাদের শাশ্বত বোধিদ্রুম—এরই ছায়াতলে যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এসে বাসা বেঁধেছে এবং ভবিষ্যতেও বাঁধবে। মনে হল, শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাবশিষ্যা মাদার সেই মহা বোধিদ্রুমেরই বীজ বপন করেছেন, ঐ ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তম্ভে। শান্তিনিকেতনের ছাতিম ছায়াও কি সেই বাসা—সেই নীড়ের স্বপ্ন দেখছে না? দেখছে না সবরমতী ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চূড়াও?

নবযুগের বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।"

কে এই "তুমি"? কবিগুরু কী চেয়েছিলেন এই তুমির কাছে? তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন এই "তুমি" কি তেমনটি হয়েই তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল? এমনি কত প্রশ্ন। উত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য এবং উত্তর দিতে যাওয়া আরও দুঃসাধ্য। কিন্তু কবিগুরুকে সামনে রেখে যদি তাঁর কথা দিয়ে তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলি,—"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো", তাহলে? তাহলে এই "তুমি"র সঙ্গে তাঁকে একাত্ম করে ধরা যেতে পারে। প্রশ্নকর্তা যিনিই হ'ন না কেন, প্রশ্নের ধরণ যাই হোক না কেন, বিদেহী রবীন্দ্রনাথ আজ সকল প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্যে সব প্রশ্নের উত্তরে একাই বলতে পারেন, তুমি যা চেয়েছ, আমি তাই; তোমার সব প্রশ্নেও আমি, উত্তরেও আমি, শুধু নিজের সম্বন্ধে তুমি অবহিত হও, তাহলেই হবে। বস্তুতঃ যিনি এত বড় কথা বলতে পারেন, "নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো, আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে" তার পক্ষেই আমার "তুমি" তোমার "তুমি" সকলের "তুমি"র সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং আমার চাওয়া, তোমার চাওয়া, সকলের চাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মেলানো সম্ভব। কিন্তু অন্যের কথা যাক। নিজের কথা বলি। জীবনে অনেকগুলো ২৫শে বৈশাখ পার করে দিয়ে এসে, আজ মনে হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে এবং যেদিক থেকেই দেখতে চাইনা কেন, তিনি "তাই" হয়েই ধরা দেন। সুতরাং শান্তি-নিকেতনে বসে আজ ২৫শে বৈশাখে যদি তাঁকে নবযুগের বাল্মীকিরূপে দেখতে চাই, তাহলে এ জগতে ক্ষতি কার? "তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?" বস্তুতঃ শ্রদ্ধাশুদ্ধ মন নিয়ে তাঁর কবিধর্ম ও কবিকর্মকে বিচার করলে তাঁকে এ উপাধি দেওয়া অবাস্তব মনে হয় না!

এর প্রথম প্রমাণ হল তাঁর রচনার অজস্রতা। তাঁর কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস, গল্প, গীতিনাট্য, হাস্য-কৌতুক, ব্যঙ্গ-কৌতুক ও প্রবন্ধ প্রভৃতিকে সামগ্রিকভাবে ধরলে তার পরিমাণ আদি কবি রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের তুলনায় কম হয় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ আদি কবির মত

মহাকাব্য রচনা করেননি এবং মহাকাব্য রচনার সংকল্প নিজ মুখে একবার ঘোষণা করলেও, সেটি তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল কিনা তাও ঠিক বোঝা যায় না। তবে সেটা সঠিকভাবে বোঝা যায়, সেটা এই যে, গীতিকাব্য কিংকিনীর স্বর-ছন্দ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং "মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়" তাঁর রচনার "কণায় কণায়" ছড়িয়ে পড়েছিল। তবু বলব যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য কণাগুলিকেই একত্র করলে, ওজনে তা বোধ হয় মহাকাব্যেরই সমতুল্য হবে। কিন্তু শুধু ওজনে নয়, ওজস্বিতাতেও সুবিশাল রবীন্দ্র সাহিত্য রামায়ণ বিশেষ। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, মহাকাব্যগত ওজস্বিতার মধ্যে যেমন বীর্যদীপ্ত সৌরভাস্বরতা থাকে, তেমনি থাকে অনুভূতিস্নিগ্ধ হৃদয়-মাধুর্য। রামায়ণ-বর্ণিত রাম-লক্ষ্মণ, বিভীষণ, বালী-সুগ্রীব, দশরথ-কৌশল্যা, সীতা, উর্ম্মিলা প্রভৃতি চরিত্র ক'টি মনে রাখলেই এই দুটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে রবীন্দ্র সাহিত্যেও যে এ দুটি বস্তুর অভাব নেই, সেকথা বোধকরি উল্লেখ না করলেও চলে। রামায়ণ যেমন রাম-সীতার কাহিনীকে আশ্রয় করে শাশ্বত কালের মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা আনন্দ-বেদনাকে রূপ দিয়েছে, রবীন্দ্র সাহিত্যেও তেমনি ললিতে ভৈরবে ধৈর্যে-বীর্যে সমন্বিত হয়ে মানব মহিমায় দীপ্তিমান হয়ে আছে; পুরাণ-বর্ণিত রামচন্দ্রের শুভ্র রাজছত্র ছায়া ভারতবর্ষে যুগ যুগান্ত ধরে ছায়াশীতল পঞ্চবটী রচনা করে আসছে। স্বর্ণমৃগ সেখানে বার বার মায়াজাল বিস্তার করে সেই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়কে চূর্ণ করে দিলেও, ভারতবর্ষ আবার সেখানেই শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে প্রশান্তি এবং ভোগে নির্বেদকে উপলব্ধি করেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যও কি তাই করছে না? আমাদের স্বর্ণমৃগ-সংশয় যুগে তা কি যুগান্তর আনে নি? বিভ্রান্তি ঘুচিয়ে আমাদের জন্মান্তর ঘটায় নি? তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-ভূমিতে জন্ম নিয়ে, পুষ্ট হয়েও কি একথার ওকালতী করতে হবে যে, তিনি আমাদের মুখে ভাষা দিয়েছেন—আমাদের নির্ভীক করেছেন—লোক ভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় থেকে রক্ষা করে এক অভয়াশ্রমে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান যুগের "বিষয় বিষ বিকার জীর্ণ ক্ষিন্ন অপরিতৃপ্ত" পৃথিবীতে বাস করে, প্রাত্যহিকতাক্লান্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আমরা কি তাঁরই দ্বারস্থ হইনা এবং সে মুক্তি কি তাঁর সাহিত্য থেকেই লাভ করি না? তাঁর হৃদয়মন্থন করা বাণী দিয়ে গড়া, সেই যে অভয়াশ্রম সে কি রামায়ণের মত আমাদের চরম দুঃখে পরম সান্ত্বনা যোগাচ্ছে না—

"অন্ধ তামসী যামিনী"র পর "তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়"-এর সূচনা করছে না? তার পরমায়ু কি শুধু "আজি হতে শত বর্ষ পরে" পর্যন্ত, না আরও পরের, আরও দূরের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত?

আরও গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাই, এই দুই মহাকবির কাব্য প্রেরণার উৎস স্থানও প্রকারান্তরে এক ও অভিন্ন। হংস মিথুনের শোক যেমন রামায়ণের শ্লোকে রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের হৃৎস্পন্দনকে উপলব্ধি করেছে, রবীন্দ্র সাহিত্যও তেমনি মূলতঃ ভারতবর্ষের দুঃখ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্বের হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করে তাকে আমাদেরও অনুভবগম্য করে তুলেছে। আদি কবির শ্লোক শোকমাত্র নয়। সেখানে শোকের অভিভবেও বৈভবের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও তাই। সেখানেও শোকের মধ্যে অশোক মন্ত্র, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে, তিনি মানুষকে এক আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করে গেছেন। "কড়িও কোমল"-এ-গড়া পৃথিবীতে বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথার মধ্যেও "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই" এই যে বাণী, আজ আর তা কেবল কবির বাণী নয়। পরন্তু সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের বাণী হয়ে গিয়েছে।

আবার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সত্তার দিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, দূর অতীত কালের আদি কবিই যেন বর্তমান শতাব্দীতে নূতনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রামায়ণ-বর্ণিত ভৌগোলিক সত্তার মধ্যে যেমন গিরিদরী-অরণ্যানী-সমন্বিত ভারতবর্ষের একটা নিখুঁত ছবি পাই, রবীন্দ্র সাহিত্যেও তেমনি সেই ভারতবর্ষ বিধৃত হয়ে আছে। এই বস্তু জগতে যেমন সরযূর কলধ্বনি আছে, তেমনি দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের উর্মিমুখরতাও আছে। ঘাত-প্রতিঘাত বিক্ষুব্ধ অযোধ্যা যেমন আছে, তেমনি আছে শান্ত সমাহিত তপোবন। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা যেমন আছে, তেমনি আছে সমতলভূমির শ্যাম সমারোহ। রবীন্দ্র সাহিত্যেও সেই একই বস্তু জগৎ অনুস্যূত। শুধু কি তাই? মানসত্তার দিক থেকেও তাঁরা সার্থক সগোত্র। রবীন্দ্র সাহিত্যে নদ-নদী তার প্রবহমানতা, তার ছন্দ, তার পারাপারারের দৃশ্য বস্তু-মণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে এক ভাবঘন জ্যোতিমণ্ডল রচনা করেছে। কবির কাছে পদ্মা একটা নদীমাত্র নয়—জলধারা মাত্র নয়, প্রাণধারা বিশেষ। উজান ঠেলে পিছনের দিকে গেলে দেখতে পাব, এই নদীসত্তাই এ দেশে মঙ্গলকাব্যে,

বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং চর্য্যাপদে কালভেদে ও কবিভেদে, বিভিন্ন ক্রমধরে প্রকাশিত, পৌরাণিক সাহিত্য সীমায় প্রবেশ করলেও দেখি, সেই একই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, যদিও তা বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের ভৌগোলিক সত্তাকে বাদ দিয়ে কাব্যের প্রাণধারা প্রবাহিত হতে পারে না। নদ-নদী-গিরি-বন-উপবন-বিবিক্ত হলে রামায়ণেরও বস্তু জগৎ সেই সঙ্গে ভাবজগৎ বলে কিছু থাকে না। কালের সুদীর্ঘ ব্যবধানকে উপেক্ষা করে আজও যে "দণ্ডক বনে ফুটে ফুলভার, সরযুর কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল শ্যাম লেখা" সে ঐ রামায়ণকাব্য দেহকে আশ্রয় করেই। ঠিক এমনি ভাবেই, সুবিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যের দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করা যায় না। কিন্তু "রামের আগে রামায়ণ রচনা" বলে যে প্রচলিত প্রবাদ আছে—এবং যে প্রবাদকে সার্থক করে মহর্ষি বাল্মীকি অমর হয়ে আছেন, তার কোনো সার্থক ইঙ্গিত কি রবীন্দ্র সাহিত্যে মেলে ?

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গত শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ক্লাসে চণ্ডীদাস সমস্যার আলোচনা। আজও মনে পড়ে সেদিনের তার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বৈষ্ণব কবি চূড়ামণির পদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাভাস বিস্ময়কর হলেও, আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কারণ মহা কবিদের দিব্য দৃষ্টিতেই ভবিষ্যতের অনেক ঠিকুজিকুষ্ঠী সঠিকভাবে ধরা পড়ে। অতঃপর সে আলোচনার সূত্র ধরে, শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"র সব্যসাচীকে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার অগ্নি যুগের দু-একজন জীবন্ত নায়কের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিলেন। তারও অনেক দিন পরে, কর্মজীবনে প্রবেশ করে, বাস্তবে একদিন আকস্মিকভাবে নেতাজীকে দেখতে পেয়ে, তাঁর পূর্বাভাস আমার শিক্ষক-বর্ণিত সব্যসাচীর মধ্যে যেন আর একবার নূতন করে উপলব্ধি করলাম। তখনই মনে মনে প্রশ্ন করলাম, বাঙ্গালীর মনের কবি! সব্যসাচীর মধ্যে নেতাজীর পূর্বাভাস কি তুমি ধ্যান-নেত্রে দেখতে পেয়েছিলে? কারণ সুভাষের এই নেতাজী মূর্তি দেখবার সৌভাগ্য তো তোমার সব্যসাচীর হয়নি? বিচিত্র নয় যে, আমার মত তাঁর অনেক ছাত্রের মনেই হয়তো এ প্রশ্ন সেদিন জেগেছিল। কিন্তু সে কথা থাক চণ্ডীদাস সমস্যার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অহিংসা ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র বিশ্লেষণ করে, পরিশেষে আমাদের প্রশ্ন করলেন কে এই বৈরাগী? মহাত্মাজীর সঙ্গে কি একে মেশানো যায় না? উত্তরের

অপেক্ষা না করেই, আবেগোচ্ছল কণ্ঠে বলে চললেন,—এক দিকে দেখ মহাত্মাজীকে, সেই সঙ্গে ভেবে দেখ সাম্প্রতিককালে সংঘটিত অসহযোগ আন্দোলনকে। আরও নিকটে এসে প্রত্যক্ষ কর মহাত্মাজীর বর্তমান কার্যধারা; যা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। অন্যদিকে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও তাঁর অনুচরদের দেখ, তাহলেই আমার বক্তব্য তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। অথচ রহস্য এই যে, এই চরিত্র সৃষ্টি করবার সময়ে বা তার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ না দেখেছেন গান্ধীজিকে, না শুনেছেন তাঁর অহিংসা ও অভয়মন্ত্রের কথা। সুতরাং "রামের আগে রামায়ণ রচনা" তোমার আমার কাছে প্রবাদ হলেও, মহাকবিদের কাছে অপরোক্ষ সত্য। চণ্ডীদাস শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পড়তে বসলে আজও তাঁর সেই কথা মনে পড়ে। ভাবীকালের চিত্র চরিত্র, তার ঠিকুজি-কোষ্ঠী শিল্পী ও মহা কবিরাই করতে পারেন।

সত্য বলতে কি, রবীন্দ্র সাহিত্য পড়তে বসলে, এমন অনেক উদাহরণই পাওয়া যায় যেখানে স্থান-কাল-পাত্র-সমন্বিত ভাবী যুগের ইতিহাস অতি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে! এ প্রসঙ্গে আমাদের অতি পরিচিত 'অপমানিত' কবিতাটিও উদাহৃত হতে পারে। এইটির রচনাকাল ২০শে আষাঢ় ১৩১৭ ইং ১৯১০। এবার মনে করা যাক্—"বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে, ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।" এই পংক্তি দুটি। সেই সঙ্গেই ধরা যাক ভারতবর্ষে বৃটিশাসনের অন্তিম যুগে বিগত দুর্ভিক্ষের বীভৎস ছবি। এখানে কবি-কল্পনা ও বাস্তব চিত্রের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে! আসলে অনাগত কালের পদধ্বনি মহাকবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়ে থাকে। এইভাবে ধরলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তিই ভাবী কালের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ আদি কবির মত মহাকাব্য রচনা না করলেও, "রামের আগে রামায়ণ রচনা" এই প্রবাদ বাক্যকে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে আর একবার নূতন করে সার্থক করেছেন। তবে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে কালভেদে স্থানভেদে, সেটি পৌরাণিক রামায়ণ না হয়ে, হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক মহাত্মায়ন, কিন্তু সেটি হয়েছে মহাত্মাজীর আবির্ভাবের পূর্বেই।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ বা ১৮ সাল থেকে গান্ধীজির মৃত্যু কাল পর্যন্ত সময় রেখাকে যদি ভারতবর্ষের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগ বলে ধরা হয়, তাহলে সে যুগ হবে গান্ধীজির। অন্যদিকে এই সময় রেখাকে যদি ভারতবর্ষের

আত্মিক ইতিহাসের একটা চরমোৎকর্ষ বলে ধরা হয়, তাহলে সেখানেও উপবাসক্লিষ্ট কৌপীনবস্ত্র-পরিহিত এই মহাত্মাজীর চারিত্র গৌরবকেই সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজী প্রসঙ্গে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে যা স্মৃত ও স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথেব কবিদৃষ্টিতে সেটাই মহাত্মাজীর আবির্ভাবের পূর্বে অতি অনায়াসে ধরা পড়েছিল।* প্রমাণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্বের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সেইসব রচনা, যার মধ্যে মহাত্মাজী স্পষ্টভাবে আভাসিত এবং যেহেতু এগুলি মহাত্মাজীকে চেনবার আগে রচিত সেহেতু সেগুলিকে কবিদৃষ্টি সঞ্জাত বলেই ধরা উচিত। স্থানাভাব হেতু বহু উদ্ধৃতি না দিয়ে আপাততঃ 'মানসীকাব্য' ও 'রাজাপ্রজা'—গ্রন্থভুক্ত গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তব্য নেওয়া যেতে পারে। বলে রাখা ভাল যে, আমাদের জীবনেই দেখেছি যে, যখন এই দণ্ডধারী সন্ন্যাসী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষকে আত্মিক সংগ্রামে উদবুদ্ধ করতে পথে বার হয়েছিলেন, তখনই

> "বেগে খুলে" গেল "সব গৃহদ্বার,
> ভেঙে" বাহিরিল "সব পরিবার,
> সুখ সম্পদ মায়া মমতার
> বন্ধন" গেল "টুটে"।

একাধারে সন্ন্যাসী ও যোদ্ধা গুরু গোবিন্দের আহ্বানে নিপীড়িত শিখ-জাতির এরূপ সাড়া দেওয়া স্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মহাত্মাজীর ক্ষেত্রে, কি তা অধিকতর সত্য নয়?

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগ রে সকল দেশ"।—এই যে উদাত্ত আহ্বান, তা কি গুরু গোবিন্দ অপেক্ষা মহাত্মাজীর কণ্ঠেই অধিকতর সার্থকভাবে ও উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নি? এবার গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি ধরা যাক। "শিখদিগের শেষগুরু গুরু গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন, তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে ......ইত্যাদি।—গান্ধীজির জীবনী সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত, আশা করি তাঁদের

---

* টীকা। অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী—"রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস" শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কাছে গুরু গোবিন্দের সঙ্গে এই চরিত্রের একাত্মতা ও সেই সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁর পূর্ণ রূপায়ণ বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই।

তৃতীয়ত গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা "শেষশিক্ষায়" দেখি, শেষ শিখগুরু আপন পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন এবং পরিশেষে নিজ হাতে বধ করা এক ব্যক্তির পুত্রকে অপত্য স্নেহে মানুষ করে, তার পরিণত বয়সে, নিজেকে তার পিতৃহন্তা বলে উত্তেজিত করে, তার আঘাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এর একটি কারণ স্ব-কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অপরটি আরও গূঢ়—তাঁর স্বপ্নভঙ্গজনিত ব্যর্থতার অবসাদ।—

"যে সংকল্প লেখা
অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে দিয়েছিল দেখা
যৌবনের স্বর্ণপটে, যে আশা একদা
ভারত গ্রাসিয়াছিল, সে আজি শতধা,
সে আজি সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয় সংকুল,
সে আজি সংকট মগ্ন······

বলা বাহুল্য, এর রচনাকালও মহাত্মাজীকে দেখার বহু আগে। অথচ গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের ছবির সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে বিভক্ত ভারতবর্ষ ও তার অধিনায়কের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। অবশ্য মহাত্মাজীর জীবনে গুরু গোবিন্দের মত আকস্মিক ক্রোধোন্মত্ততা কখনও দেখা যায় নি, বা তার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়নি। বরং জাতীয় ও বিজাতীয় প্রমত্ত-তার জন্যই তিনি বারবার উপবাসের হোমানলে আত্মহুতি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তথাপি তাঁকে তাঁর মতই দেখে যেতে হয়েছিল "সংকীর্ণ শীর্ণ সংশয় সংকুল" ভারতবর্ষকে এবং তাঁর মতই তাঁকে আততায়ীর আঘাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। হে নবযুগের বাল্মীকি, বিগত যুগের শিখ নায়কের মধ্যে অনাগত ভারত-ভাগ্য-বিধাতাকে তোমার যে দিব্যদৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল—যে দিব্যদৃষ্টির বলে তুমি "রামের আগে রামায়ণ রচনা"—প্রবাদকে অতীতের অন্ধকার থেকে বর্তমানের আলোয় উদ্‌ভাসিত করলে—সে দৃষ্টির আলোকে কি এই ভারতভাগ্য-বিধাতার শেষ পরিণামও ধরা পড়েছিল ?

জানি, এ না হলে তোমার মহাত্মায়ন—তোমার রামায়ণ সম্পূর্ণ হতো না। কিন্তু সে দৃষ্টি কি তার পাঠকদের উপর একবারও পড়ল না—তোমার কল্পনা-কমণ্ডুল থেকে এক বিন্দু করুণা বারিও কি তাদের জন্য বর্ষিত হ'ল না ?

বর্ণপরিচয়ে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ

সকল ভাষাতেই বর্ণপরিচয়ের পথ বোধ হয় পাথর দিয়ে তৈরী। ফলে তার উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সকল শিশুরই কোমল চরণ রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার বর্ণপরিচয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এমন কি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছেও যে সে-পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা, এবং তাঁকেও যে অনেক চোখের জল ফেলে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রাতঃকালে স্মরণ করতে হয়েছিল, তা বোঝা যায়, "জীবনস্মৃতি" পড়লে! সেখানে দেখতে পাই যে, "কর খল" প্রভৃতি বানানের অনেক "তুফান" পাড়ি দিয়ে, তবে তিনি "কূল" পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন আপন "চৈতন্যের মধ্যে" "জলপড়া পাতা নড়ার" মিল, তাঁর জীবনের "আদিকবির প্রথম কবিতা।" আমার দৃঢ় ধারণা, জীবন শৈশবে বর্ণপরিচয়ের এই বেদনার স্মৃতি তাঁকে বাংলা দেশের সকল শিশুর বর্ণপরিচয়ের বেদনা উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছিল। নতুবা খ্যাতির উচ্চ শিখর থেকে অবতরণ করে শিশুর পাঠশালা প্রাঙ্গণে বসে তিনি তাদের জন্য "সহজ পাঠ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করতেন না। অন্যদিকে "আদিকবির প্রথম কবিতার" ছন্দের আনন্দ-স্মৃতিও তাঁর মনে ছিল। ফলে বর্ণপরিচয়ের বন্ধুর পথকে কেমন করে ছন্দের মাধ্যমে মধুর করা যায়, সে ভাবনাও তাঁর মাথায় ছিল। বস্তুতঃ এই ভাবনারই সার্থক রূপায়ণ হ'ল তাঁর ঐ বই দু খানি। এবং সবদিক থেকে বিচার করলে সহজপাঠ-প্রণেতাকে বর্ণ-পরিচয়ের নবগুরু আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে।

কিন্তু তার পূর্বে বর্ণপরিচয়ের অন্যতম গুরু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ" বই দুখানিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। দুঃখের বিষয় প্রথম ভাগের মূল সংস্করণ থেকে বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ-কথিত "আদিকবির প্রথম কবিতা"কে নির্বিচারে নির্বাসিত করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বই দু-খানির মূল্যবত্তা কোনদিন নিঃশেষিত হবে না, কারণ বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ সংস্কার সাধনে, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শাস্ত্রসম্মত পৃথকীকরণে, হলন্ত ও অকারান্ত শব্দগুলির উচ্চারণ নির্ধারণে, এবং ত কারের ত এবং ৎ—এই দুইরূপ প্রদর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শ্রম ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা একাধারে তাঁর মত শিক্ষা-ব্রতী ও সংস্কার-ধর্মী মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

অবশ্য একথা ঠিক যে, বর্ণপরিচয় ১ম ভাগে, যথাক্রমে বর্ণানুক্রমিক, শব্দানুক্রমিক এবং পরিশেষে বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে বর্ণপরিচয়, পরে বর্ণযোজনা এবং তার পরে বাক্য এসেছে। এটি আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্র সম্মত নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে, সে যুগে বর্ণপরিচয়ের শিক্ষা-বিজ্ঞান গড়ে ওঠেনি। এছাড়া, অন্য দিক থেকে দেখলে বইখানি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের মানদণ্ডে খাটো পড়বেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রথমভাগের বাক্যগুলির বহর শিশুর পক্ষে অনুপযুক্ত নয়, এবং তার শব্দগুলিও শিশুর পরিচিত পরিবেশ-আহৃত। তৃতীয়তঃ, তার দু একটি বাণীচিত্র শিশুকে কল্পনার অবারিত নীল আকাশে নিয়ে না গেলেও, অন্ততঃ মিলের তোরণ পযন্ত নিশ্চয়ই পৌছে দেয়। যেমন "পথ ছাড়, জল খাও, হাত ধর, বাড়ী যাও।" বা "কাল পাথর, সাদা কাপড়" ইত্যাদি। আমার বিশ্বাস এই অংশগুলি শিশুকে বিচ্ছিন্নভাবে না পড়িয়ে, একটানা পড়িয়ে দিলে সে নিশ্চয়ই খুশী মনে বাড়ী ফিরবে। পরিশেষে এটিও লক্ষণীয় যে, প্রথম ভাগের বাক্যগুলি ১ম পাঠ থেকে ২০তম পাঠ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান আকারে সজ্জিত। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এটিও মনস্তত্ত্ব-সম্মত।

অতঃপর বর্ণপরিচয়—১ম ভাগের উদ্দেশ্য যেমন অসংযুক্ত বর্ণপরিচয় করানো, তেমনি দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য সংযুক্ত বর্ণপরিচয় করানো। এর বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখছেন—"ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া, ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে।" এ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মত নীরস জিনিষের সরস পরিবেশন সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু যুগটা ছিল ঠাসা মাষ্টারীর যুগ, সেইহেতু বোধ হয় ২য় ভাগের সকল পাঠই নীতি-বাক্যাশ্রয়ী হয়েছে, এবং শিশুমনের উপযুক্ত খোরাকও সেখানে সুদুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাঠগুলির সরলতা সম্বন্ধে বোধ হয় দ্বিমত নেই। অবশ্য এখানেও শুরু শব্দ দিয়ে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উদাহৃত সংযুক্তবর্ণ-সমন্বিত শব্দগুলির মধ্যে যেটি শিশুর পক্ষে বোধগম্য, মাত্র সেই শব্দকেই বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানও এই কথা বলে। এদিক থেকে তাঁকে বর্ণপরিচয়ের অন্যতম স্থপতি বলা চলে।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার যে, এই দুখানি বইই তাঁর সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩০৩ সালে "পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন" করেছিলেন। বর্তমানে এই সংস্করণই চলছে। তাছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "পথাবলম্বনে" শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-প্রণীত বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগও উল্লেখ্য, তবে এতে পৃষ্ঠা সংখ্যার হ্রাস ছাড়া আর কোনদিকের বৃদ্ধি ঘটেনি। অন্যদিকে নারায়ণচন্দ্র-পরিবর্তিত প্রথম ভাগের সংস্করণের প্রধান সম্পদ হল, প্রত্যেক বর্ণের নীচে এক একটি প্রাসঙ্গিক ছবি। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণপরিচয়ের ইতিহাসে, বর্ণের সঙ্গে ছবির যোজনা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মাত্র এই কাজের জন্যই বিদ্যারত্ন মহাশয় পরবর্তী কালের শিশু রবীন্দ্রনাথদের ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন এবং শিক্ষাবিদেরাও তাঁকে নমস্য করে রাখবেন। কারণ বর্ণের সঙ্গে ছবির যোজনায় বাংলার শিশুদের প্রতি সরস্বতীর এই যে "মাতৃভাবের লক্ষণ" দেখা দিল, সেটাই পরবর্তী কালের গ্রন্থ-প্রণেতাদের হাতে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

অতঃপর বিগত কয়েক বৎসর ধরে বর্ণপরিচয়ে যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, তার প্রমাণ বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের বহু নদনদী খাল বিল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রান্ত ও অন্যতম শিল্পী হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। কিন্তু সে কথা বারান্তরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। আপাততঃ দেখা যাক সে ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত ও আচার্য নন্দলাল বসু চিত্রিত সহজপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কোন্ সম্পদ দিয়ে গেল!

কিন্তু সে সম্পদের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিপদে পড়তে হয় যখন সহজ পাঠ—প্রথম ভাগের প্রথম পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখি যে, "এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়," অথচ ওর মূল পাণ্ডুলিপিতে এ নির্দেশ নেই। অন্যদিকে এ নির্দেশ মানতে হলে, এটাই ধরে নিতে হবে যে, বর্ণপরিচয়ের বেদনা লাঘব করবার জন্য বাংলার শিশু অন্য যাঁর কাছেই যাক না কেন, শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথের কাছে নৈবচ নৈবচ, একি ভাবতে পারা যায়? বস্তুতঃ এ ভাবনাকে আমল দিতে হলে, নিজের বর্ণপরিচয় প্রসঙ্গে "জীবনস্মৃতি"তে উদ্ধৃত শিশু রবীন্দ্রনাথের আনন্দ-বেদনার স্মৃতিকেও মুছে ফেলতে হয়, অথচ ঐ স্মৃতিই পরিণত রবীন্দ্র-নাথকে সহজপাঠ-প্রণেতা হ'তে সহায়তা করেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে কি পূর্বোদ্ধৃত নির্দেশটি খোদার উপর খোদকারি? এর উত্তর যাই হোক না কেন, আমার ধারণা "এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়" নয়, বর্ণপরিচয়েই

পঠনীয়। কারণ মনস্তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞান বর্ণপরিচয়ে যা কিছু চায়, তার সবটাই সহজপাঠে আছে। মনস্তত্ত্ব বলে শিশু প্রথমে বর্ণ বলতে শেখে না, এমন কি শব্দও নয়। সে যখন "মা" বলে, তখন "মা" একটি শব্দরূপে উচ্চারিত হলেও, তার মধ্যে একটা বাক্য থাকে, যদিও সে বাক্য অনুচ্চারিত। সে বাক্য বোঝে শিশু আর শিশুর মা, এবং এই "মা"কে কেন্দ্র করেই ক্রমে ক্রমে সে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শভরা ধরিত্রীকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জেলে আরতি করতে শেখে। কারণ "মা" উচ্চারণ করতে গিয়ে সে "মা"কে নিঃসঙ্গভাবে উচ্চারণ করে না, সে মায়ের ছবি দেখে, মায়ের শব্দ শোনে, মায়ের স্পর্শ পায়, এবং সেই সঙ্গে মাকে ও নিজেকে একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যেও দেখে। কিন্তু এগুলি পৃথকভাবে ঘটে না, ঘটে যুগপৎ। সুতরাং শিশুদের বর্ণপরিচয় করতে বর্ণকে নিঃসঙ্গ রাখলে চলবে না, তাকে জুড়তে হবে বাক্যের সঙ্গে, ছবির সঙ্গে —পৃথকভাবে নয়, যুগপৎ এবং তাহলেই নিঃসঙ্গ ও নিষ্প্রাণ বর্ণ স-সঙ্গ ও স-প্রাণ হয়ে উঠবে। সহজপাঠ প্রথমভাগে রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ কাজই করে গেছেন।

"ছোটো খোকা বলে অ, আ

শেখেনি যে কথা কওয়া।" —এই শ্লোক, যে ছোটো খোকা কথা বলতে শেখেনি, তাকে যেমন কথা বলতে শেখায়, তেমনি তাকে "অ, আ"ও চেনায়, —চেনায় বাক্যের মধ্য দিয়ে, এবং সর্বোপরি ছন্দের মধ্যে দিয়ে। আবার—

"ঘন মেঘ বলে ঋ

দিন বড়ো বিশ্রী।"—এ শ্লোকটিও তাই করেছে এবং তার ওপরে শিশুকে একটা মহৎ সম্পদ দান করেছে। সে "মহৎ সম্পদ" হল এর অন্তর্নিহিত ছবি। এ ছবি শ্লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে, অথচ পড়তে গেলেই রূপকথার রাজকন্যার মত ছন্দের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে ওঠে। বলা বাহুল্য, বর্ণ পরিচয়ে আঁকা ছবি চাই-ই এবং সে কাজ করেছেন আচার্য নন্দলাল বসু। এতে শিশুর চোখ ভুলেছে, চোখ ফুটেছে। কিন্তু "ঋ" যখন বাক্যের মাধ্যমে ছন্দের দোলায় চেপে শিশুর কাছে উপস্থিত হল, তখন সেটি শুধু তার কান জুড়ালো না, তার মনও স্পর্শ করল এবং তার মানস-মুকুলের দল খুলতে সাহায্য করল। কারণ এ শ্লোকের অন্তর্নিহিত বাণীচিত্র তাকে তার অজ্ঞাতসারে "মেঘকজ্জল দিবসের" অস্পষ্ট মায়ারাজ্যে পৌঁছে দেয়। সংক্ষেপে বর্ণপরিচয় করতে গিয়ে সে তার অজ্ঞাতসারে সাহিত্য পাঠের দীক্ষাও গ্রহণ করে। বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে সাহিত্য পাঠে এই যে দীক্ষাদান, এটিই একান্তভাবে সিদ্ধবস্তুর

মত, সহজপাঠ প্রথম ভাগে ছড়িয়ে আছে। এবং এটিই বোধ হয় বর্ণপরিচয় প্রণেতা রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় দান।

অতঃপর বইটির শেষের দিকে পাই "আলো হয়, গেল ভয়।"—প্রভৃতি চার অক্ষর-সমন্বিত পংক্তির দোলা, অন্যদিকে "বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখী।"—প্রভৃতি গদ্যাংশগুলি পড়তে গিয়েও বোধ হয় শিশু শুনতে পায় বাঘের ডাক, দেখতে পায় পাখীকে; হয়তো বা তার গানও শুনতে পায়।

ক্রমে সহজ পাঠ প্রথম ভাগ থেকে দ্বিতীয় ভাগে পৌছালে দেখি যে, যুক্তাক্ষর শেখাবার জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দ অতি সযত্নে চয়ন করে বাক্যের মালা গাঁথা হয়েছে, তেমনি যুক্তাক্ষরগুলির পুনরুক্তি ঘটিয়ে, শিশুমনে একটা স্থায়ী দাগ কাটবার জন্যও তিনি সার্থক চেষ্টা করেছেন। "আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন।" প্রভৃতি বাক্যগুলি লক্ষ্য করলেই সেটি বোঝা যায়। পদ্যাংশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, উপরন্তু লাভ হয়েছে ছন্দের দোলা। অবশ্য এই বই দুটিতে রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতন ভাবেই কলম ধরেছেন, কিন্তু মূলতঃ যে তিনি কবি, সেটি আদৌ দুর্লক্ষ্য হয়নি। "অঞ্জনা-নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে"র "কুঞ্জবিহারী"র "গুঞ্জনস্বরে" শিশু শুধু "ঞ্জ"কে চিনেই ক্ষান্ত হয় না, তার কান মন দুই-ই জুড়োয়। কুঞ্জের "খঞ্জনীর ঝনঝনি" বই পড়া হয়ে গেলেও তার কানে লেগে থাকে। এবং সেই সঙ্গে কবিতার অন্তর্নিহিত ছবি দিয়ে শিশু তার পরিচিত পরিবেশকে আবার নূতন ভাবে গড়ে নেয়। সে পায় সৃষ্টির আনন্দ। অন্যদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের বাক্যগুলির মধ্যে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত বর্ণের পুনরুক্তি, বাক্যের ক্রমবর্ধমান বহর এবং শিশু-পরিবেশ-আহৃত শব্দ দিয়ে বাক্যগুলির গঠন প্রভৃতির কথা মনে রাখলে বলতে হয় যে, বর্ণপরিচয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান এতদিন ধরে এই সমন্বয়ই কামনা করে আসছিল। সহজপাঠ-প্রণেতা রবীন্দ্রনাথ এই সমন্বয়েরই শ্রেষ্ঠ সাধক। এর ফলেই আজ বাংলাদেশের শিশুদের ভেজা চোখে হাসির দীপ্তি এবং খুশীর আমেজ। এর জন্যেই বর্ণপরিচয়ের বন্ধুর পথ আজ তাদের কাছে মধুর হয়ে উঠেছে।

এখন যদি বর্ণপরিচয় প্রণেতা হিসাবে পূর্বসূরী বিদ্যাসাগর ও উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথকে পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে এই কথাই মনে হবে যে, একজন বর্ণপরিচয়ের অন্যতম স্থপতি, অন্যজন তার অন্যতম কারুশিল্পী; একজন বর্ণকে চিনিয়ে দেন, অন্যজন তার সঙ্গে সাহিত্য পাঠেও দীক্ষা দেন, একজন বর্ণপরিচয়ের গুরু, অন্যজন তাঁর নবগুরু।

পরিশেষে আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সহজপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-সন্নিবিষ্ট সব কবিতাই ভাব ও ছন্দের দিক থেকে বর্ণপরিচয়- করতে-থাকা শিশুর পক্ষে উপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক শিক্ষককে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুনেছি। এ প্রসঙ্গে "এসেচে শরৎ, হিমের পরশ লেগেচে হাওয়ার পরে" এবং "ষ্টীমার আসিছে ঘাটে, প'ড়ে আসে বেলা" প্রভৃতি কবিতা উদাহৃত হয়ে থাকে। এ সন্দেহ নিরাকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হওয়াই ভাল মনে করি। তিনি বহুবার বহুভাবে এই কথাটা বলেছেন যে, "শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা" বুঝিয়ে দেওয়া নয়, "মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।" সুতরাং ঐ সূত্র ধরে বলতে পারি যে, ও সব কবিতার "আনন্দ-আবেগ-পূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই" শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। ঐ বয়সে ও-জাতীয় কবিতার "আগাগোড়া" বুঝতে পারাই "সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে।" অবশ্য "ষ্টীমার আসিছে ঘাটে" জাতীয় কবিতা পড়বার সময় ছন্দের দিক থেকে শিক্ষককে সাবধান হতে হবে বৈকি। তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ও-কবিতা দু-একবার সরবে পড়ে দেবার পর, বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিনি। কারণ "ষ্টীমার ঘাটে এসেছে" অনেক পরে, দ্বিতীয় ভাগের প্রায় শেষের দিকে। আসলে ও-গুলি পড়াতে বসে উপযোগিতার চেয়ে উপভোগ্যতাকেই বড় করে দেখা উচিত। তবে যে শিক্ষক সব কিছুকেই পরীক্ষায় ফলাফল দিয়ে বুঝতে চান, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এবং সেক্ষেত্রে "ভগবান তাঁদের রক্ষা করুন", এই প্রার্থনা করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

শিক্ষক-শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস বহু বিবর্তিত। কিন্তু এদেশে বৃটিশজাতির আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত গত কয়েক শতাব্দীতে সে ইতিহাস অতি দ্রুতকালে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও সেটা হচ্ছে। অতএব ভবিষ্যৎ-বক্তা না হয়েও অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এধারা চির-প্রবাহমানই থাকবে! অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, বর্তমানের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও অনেকে প্রশ্ন করেন—শিক্ষকের পক্ষে কি সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়? তার উপর ফাউ স্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষণের আবার কি দরকার? এ প্রশ্নকে হয়তো উন্নাসিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু সেটাও একধরণের উন্নাসিকতা। আমার ধারণা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির কাছ থেকে বর্তমান ভারতবর্ষ যা আশা করে, তা সর্বক্ষেত্রে পাচ্ছে না বলেই হয়তো এ ধরণের প্রশ্ন জাগছে। সে যাই হোক, এ প্রশ্নোত্তর এ প্রবন্ধের এলাকার বাইরে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই কয়েক শ' বছরের শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাস ও তার গতি-প্রকৃতি। আমার মনে হয় যে, এ আলোচনায় আজ প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীরই অংশ গ্রহণ করা উচিত। কারণ ইতিহাসের ইতিহাস বলে, অতীতে যে সব ভুলত্রুটি তুমি করেছিলে, তা যদি সংশোধন করতে চাও,—অতীতে পথ চলতে গিয়ে যে সব খানা-খন্দে প'ড়ে তোমার চলা ব্যাহত হয়েছিল,—যদি সে-সব এড়িয়ে তোমার পথ-চলাকে বর্তমানে অব্যাহত রাখতে চাও,—তাহলে ইতিহাস-আহৃত শিক্ষাকে তোমায় সাদরে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেই হবে। আর তা করতে হলে অতীত ইতিহাস-পৃষ্ঠাই হবে তোমার ভবিষ্যৎ মুক্তি-জাহ্নবীর প্রথম ভগীরথ।

এবার আলোচনার স্থবিধার জন্য সে ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে,—(এক) বৃটিশ জাতির আগমন থেকে ১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত, (দুই) ১৮৫৪ খৃঃ থেকে ১৯৪৮ খৃঃ এবং (তিন), ১৮১৮ খৃঃ থেকে আজ পর্যন্ত।

প্রথম পর্বে, শিক্ষক-শিক্ষণকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে সাধারণ শিক্ষা শেষ করেই এক শ্রেণীর মানুষ শিক্ষকতায় নামতেন। অতঃপর মাদ্রাজের গভর্ণর মুনরো ১৮২৬ সালের ১০ই মার্চের মিনিটে লিখিলেন "শিক্ষার অগ্রগতি উন্নত ধরণের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া হতেই পারে না।" শুধু তাই

নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের উন্নত ধরণের শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাজে একটি ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার কথাও তিনি সুপারিশ করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ বলতে যা বোঝায়, তা হয়তো তখনও তাঁর কল্পনায় আসেনি। কিন্তু শিক্ষক সম্প্রদায়ের পক্ষে যে গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়—তার ওপরেও কিছু দরকার—মাত্র এই ধারণার জন্যই তিনি শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবেন। তবে দুঃখের বিষয় হল এই যে, তাঁর অকাল মৃত্যুতে না হল কোন ইস্কুল-প্রতিষ্ঠা, না হল শিক্ষক-শিক্ষণের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথমেই দেখি যে উডস্ ডেস্প্যাচে ভারতের প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ রয়েছে। তবে প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষকের কথাই এখানে মুখ্য ছিল। অনতিবিলম্বে নূতন শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্প্রদায়কেও শিক্ষিত করে তোলবার প্রশ্ন জোরদার হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে, বোম্বাইয়ের শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা হাবার্ডের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। কারণ তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেখানে ইংরেজী ইস্কুলের সহকারী শিক্ষকদের জন্য স্থায়ীভাবে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ১৮৫৭ সালে দেখা দিল এক কাল-বৈশাখী। ফলে হাবার্ড প্রস্তাবিত শিক্ষক-শিক্ষণের স্বপ্নসৌধ গড়ে ওঠবার কোন অবকাশই হল না।

এদিকে মাদ্রাজ তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সৈদাপেটে আজ যে বিখ্যাত শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মাথা তুলে তুলে দাঁড়িয়েছে, তার প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট নরম্যাল স্কুলকে কেন্দ্র করে। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে সৈদাপেটকে অগ্রদূত বলে ধরলে, বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। অতঃপর এই জাতীয় আর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাই, লাহোরে। এটি স্থাপিত হয় ১৮৭১ সালে। বর্তমানে আশ্চর্য লাগলেও একটা কথা জানা দরকার যে, এই দুটি প্রতিষ্ঠানেই একসঙ্গে স্নাতক ও অস্নাতকদের স্থান দেওয়া হ'ত এবং একই পাঠ্যসূচী একই সঙ্গে পড়ানো হতো। তা ছাড়া, "কেমন করে পড়াতে হবে,"—এ কথার চেয়ে "কি পড়াতে হবে" এটার ওপরেই এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেশী জোর দেওয়া হতো।

শিক্ষা-শিক্ষণের ইতিহাস যখন এইভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তখন বসল সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন (১৮৮২)। এতে স্পষ্ট করে বলা হল যে,

মাধ্যমিক স্কুলে স্থায়ীভাবে কোন শিক্ষককে নিযুক্ত করতে হলে, তাঁকে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষাশাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাছাড়া, স্নাতক এবং অস্নাতকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীও পৃথক করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এখান থেকেই মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রথম পদযাত্রা। দেখতে দেখতে মাদ্রাজ নরম্যাল্ স্কুলের কলেজ পর্যায়ে উন্নতি (১৮৮৬), নাগপুর ট্রেনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৯), রাজা মুন্দ্রীর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন (১৮৯৪), লক্ষ্ণৌ ট্রেনিং কলেজ এবং আর দু'একটি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা ছটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় দুশো শিক্ষক-ছাত্র পাই। এরপর এল একাধারে অতি-নিন্দিত ও অতিবিখ্যাত কার্জনী আমল। সে যাই হোক, লর্ড কার্জনই বোধহয় সর্বপ্রথম তাঁর শিক্ষাসংস্কারে (১৯০৪) শিক্ষা-দান-প্রণালীকে একটা বিশেষ শিল্পের মর্যাদা দিলেন। ফলে খোঁজ পড়ল উপযুক্ত প্রবীণ শিক্ষকদের, যাঁরা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক তৈরী করবেন। এর জন্য কলেজে কলেজে গ্রন্থাগার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবস্থার কথাও তাঁর শিক্ষাসংস্কারে সুপারিশ করা হল। সেই সঙ্গে এটিও স্থির হল যে, স্নাতকদের দু-বৎসর করে শিক্ষাশাস্ত্রে পাঠ নিতে হবে। এমন কি, বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য যে ইন্-সার্ভিস ট্রেনিং প্রবর্তিত হয়েছে, তার কথাও কার্জন সে সময়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, সেই সময় থেকেই শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে একটি করে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকা দরকার, সেকথা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

অবশ্য কার্জনের এই সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করবার একটা সার্থক প্রচেষ্টা দেখা দেয় ১৯১৩ সালে। কারণ এই সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, সাধারণভাবে শিক্ষিত যে কোন লোকই যে শিক্ষকের আসনে বসবেন তা হবে না। এর জন্য তাঁকে শিক্ষাদান প্রণালীও সাঁতার কেটে পার হতে হবে। এটারই একটা উল্লেখ্য সংস্কার হয় স্যাড্‌লার কমিশনে (১৯১৭)। এতে প্রস্তাব করা হয় যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিভাগের মত একটা শিক্ষা বিভাগও থাকবে, এবং তার কেন্দ্রে থাকবেন একজন প্রধান অধ্যাপক। কমিশনের অপর প্রস্তাব হল এই যে, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা বড় প্র্যাক্টিসিং স্কুল ছাড়াও

একটা করে ছোট একস্‌পেরিমেণ্টাল্ স্কুল থাকা চাই। দ্বিতীয়টি হবে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারখানা বিশেষ। সংক্ষেপে এখানকার উৎপন্ন ফসলই প্রথমটিকে পুষ্টি যোগাবে। বস্তুতঃ স্যাড্‌লার কমিশনই ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষানীতির সার্থক অগ্রদৌত্য সূচনা করেছিল। কারণ পরোক্ষে এই কমিশনই কতিপয় ভারতীয়কে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং জার্মানী প্রভৃতি দেশের নূতন শিক্ষানীতি দেখবার ও এ বিষয়ে ভাববার প্রেরণা জুগিয়েছিল। এবং এঁরাই দেশ-বিদেশ ঘুরে স্বদেশে এসে শিক্ষা সংস্কারে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করতে অগ্রণী হলেন। সত্য বলতে কি, ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত, ভারতীয় শিক্ষা ব্যাপারে বিদেশী শাসকেরাই বেশী করে ভেবে আসছিলেন,—এবং ভেবে আসছিলেন তাঁদের মত করে। কিন্তু এখন থেকে এদেশের শিক্ষার ভার এদেশীয়দের ওপর বর্তাল। অবশ্য তখন পর্যন্ত শিক্ষা-প্রণালীর পাঠ্যসূচী অপরিবর্তিই ছিল। ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯৪৮-৪৯) লিখেছেন,—"ভারতের প্রায় সকল শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রেই এক পাঠ্যসূচী চলছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনেক স্থানেই কোন সংযুক্ত বিদ্যালয় নেই—এবং শিক্ষকদের প্রস্তুতি-পর্বে কোন বিদ্যালয় দাবি করছেন বিশেষ দশটি পাঠ বিশেষ শ্রেণীতে দিতে হবে, আবার কোন বিদ্যালয় চাইছেন ষাটটি আদর্শ পাঠ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, তখন সেখানে ডামাডোলের বাজার।

অতঃপর সে ইতিহাসের শেষ পর্বে, অর্থাৎ ১৯৪৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব নিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে যেখানে ৪১টি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে স্নাতকদের শিক্ষা দেওয়া হতো, ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে সেখানে ৮৩টি সরকারী ও ১৬১টি বে-সরকারী ট্রেনিং কলেজ গড়ে উঠেছে। তাছাড়া আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩১টি কলেজ। এই ২৭৫টি কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রায় দশগুণ বেড়ে গেছে (১৯৪৭-৪৮—শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল—৩,২৬২ জন, ১৯৪৬-৪৭ সালে সেটা হয়—২৯,০৪৪ জন।)

এই প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশনের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের সুপারিশমত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেমন পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি তার সঙ্গে তাল রেখে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে আজ শিক্ষার্থীদের তাঁদের নূতন ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত রাখা হচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান। আজমীড়, ভোপাল, ভুবনেশ্বর ও মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত এই ৪টি আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মূল্য যাচাই

করবার সময় অবশ্য এখনও আসেনি। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, সুপরিচালিত হলে এই সব আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষণের ইতিহাসে নূতন কীর্তি স্থাপন করবে। কারণ এখানে শুধু স্নাতকদেরই শিক্ষিত করা হয় না, অধিকন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরও এখানে ভর্তি করে শিক্ষকের উপযুক্ত সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা একাদিক্রমে তিন বৎসর ধরে যুগপৎ দেওয়া হয়। এই সব তরুণ-তরুণীদের গ্রহণ করবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি যে ইস্কুলে পাচ দশ বছর-কাটানো স্নাতকদের চেয়ে বেশী, তাতে বোধ হয় দ্বিমত নেই। ফলে প্রথম দলকে শিক্ষক করে তোলা যত সহজ, দ্বিতীয় দলকে ততটা নয়। এছাড়া যে সমস্ত শিক্ষক নানা অসুবিধায় পড়ে ট্রেনিং কলেজে প্রবেশ করতে পারেন নি, তাঁদের জন্যও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ইন্-সার্ভিস ট্রেণিং দিতে এগিয়ে এসেছেন।

বর্তমান ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে আর একটি ঘটনাও বিশেষভাবে ধর্তব্য। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এখানে শিক্ষা-সম্বন্ধে আধ ডজন পি এইচ-ডি এবং এক ডজন এম্-এড্ দুষ্প্রাপ্য ছিল, আজ সেখানে এ দুটোই অপ্রতুল নয়। তাছাড়া স্নাতকোত্তর শিক্ষাগবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক-এন সি আর টি এবং ইউ জি সির প্রচেষ্টাও আজ ব্যাপক হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইউ, জি, সি-অনুমোদিত—বরোদা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এ্যাড্ভান্সড্ স্টাডি ইন এডুকেশন্ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণে এক বিশেষ অধ্যায় সূচিত করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু এসব উন্নতি সত্ত্বেও এখনও আমরা "সব পেয়েছির দেশে" পৌছাই নি। একটা জাতি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছায় ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সাধনার দ্বারা—ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে সুচিন্তিত যোগসূত্র রচনা করে। শিক্ষক-শিক্ষণের বর্তমান অধ্যায়ে তারই পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষালয়

কিছুদিন আগে ট্রেনে যেতে এক ভদ্রলোকর সঙ্গে আলাপ হল। প্রসঙ্গক্রমে "সংস্কৃতির কথা উঠলে তিনি মন্তব্য করলেন যে, ওর পরিচয় রয়েছে বিটোভেনের সংগীতে, রবীন্দ্রনাথ বা সেক্সপীয়ারের সাহিত্যে। অবশ্য সেই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের ঐ জাতীয় সম্পদকেও ধরতে হবে। মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, বিটোভেনের সংগীতের আশেপাশে পপ্ সঙ্ তো গজাচ্ছে, সেকস্‌পীয়ারের সময়েও মর্যালিটি প্লে ছিল এবং রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে কবিগানও চলছে। শুধু আছে বা ছিল বললেই হয় না, বস্তুতঃ এগুলি চিরকালই আছে এবং থাকবে। থাকবে সমাজের একটা প্রকাণ্ড অংশের মধ্যে অতি প্রকট হয়ে। তাহলে এই সমস্ত বস্তুকে কি আপনি সংস্কৃতি পদবাচ্য করতে চান না? ভদ্রলোকের গন্তব্যস্থল এসে গিয়েছিল, আমার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করবার সময়ের অভাবেই হোক, অথবা আমার অজ্ঞতার প্রতি করুণা করেই হোক, হঠাৎ ঝরঝরে বাংলা ছেড়ে নড়বড়ে ইংরেজীতে তড়বড় করে যা বলে গেলেন, তার সার-সংক্ষেপ হল এই যে, ঐ সব বাদে বস্তুকে যারা সংস্কৃতি বলে মনে করে, তাদের পক্ষে মস্তিষ্করোগবিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। ভদ্রলোক তো নেমে পড়লেন, কিন্তু তার কথাগুলি আমার মাথায় চেপেই রইল। পরে মনে হল, একাধারে বহুল ও শিথিলপ্রযুক্ত সংস্কৃতি শব্দটিই যত নষ্টের মূল। সত্যি বলতে কি, সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় আর কি বোঝায় না—তাই নিয়েই গোল বাধে। একদল যখন ভাবেন যে, সংস্কৃতি, বলতে একটা জাতির আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আহার-বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এমন কি বিশ্বাস-অবিশ্বাস পর্যন্ত সব কিছুকেই বোঝায়, অন্যদল তখন বহু বিচার করে মাত্র কয়েকটিকেই সংস্কৃতি হিসাবে ছাড়পত্র দিতে রাজী হন। সুতরাং ম্যাথিউ আরনল্ড্ যখন বলেন যে, সংস্কৃতি হল একটা জাতির চিন্তা ও বাণীর চরমোৎকর্ষ এবং তার শেষ পরিণতি হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা, তখন সে সংজ্ঞাকে মেনে নিলেও মনের মধ্যে একটা কিন্তু থেকে যায়। কারণ সংস্কৃতিপুষ্ট এমন পূর্ণ মানুষ মর্ত্যে তো দূরের কথা স্বর্গের নন্দনকাননেও বোধ হয় বিরলদৃষ্ট। অন্যদিকে যে কোনও সমাজের

একটা অতিবৃহৎ অংশ এখনও দেবতা-অপদেবতা, গ্রহ-উপগ্রহ, ঝাড়-ফুঁক, গাছ-পাথরকে সামনে রেখে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অজগর-গতিতে এগিয়ে চলেছে। সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষের কাছে যে বজ্রপাত একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এর কাছে সেটা ভগবানের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার বলে স্বীকৃত হয় এবং সে ক্রোধ উপশমের জন্য পূজাও দেওয়া হয়। কিন্তু এওতো এক ধরণের সংস্কৃতি। আমার ধারণা সব সমাজেই সংস্কৃতির দুটি ধারা পাশাপাশি চিরপ্রবহমান। এক, অতি-ব্যাপ্ত অমার্জিত লোকসংস্কৃতি, দুই, পরিমার্জিত অতি-সীমিত সংস্কৃতি। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য বিপুল পরিধি, দ্বিতীয়টির ক্রম-সূক্ষ্ম তুঙ্গতা। তুঙ্গস্থানে অবশ্য বৃহস্পতিরাই থাকেন, কিন্তু পরিধির পাদপীঠও তাঁদের প্রয়োজন। কারণ সেকস্‌পীয়ার এবং তাঁর পূর্বসূরীরা তৎকালিক জনসাধারণের বিশ্বাস-অবিশ্বাস-আশ্রিত লোকসংস্কৃতিকে মার্জিত করেই তাঁদের অমর কাব্য রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রান্ত প্রতিভা নন। কারণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-নৃত্যকলাও লোকসংস্কৃতি-আশ্রয়ী হয়েই লোকাতিশায়ী। সুতরাং ইতিহাস এই সাক্ষি দেয় যে, তথাকথিত লোকসংস্কৃতি থেকেই ম্যাথিউ আরনল্ড্‌-ব্যাখ্যাত সংস্কৃতি প্রাণরস সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের নজির অতি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসেও দেখা যায়। কিছুদিন আগে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সুযোগ্য সাকরেদ তিমিরবরণ কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে যে অর্কেষ্ট্রার আয়োজন করেছিলেন আশাকরি তার স্মৃতি এখনও অনেকের মনে আছে। সে আসরে সেতার-সরোদ, বেহালা-জলতরঙ্গ, বাঁশী-তারসানাই, পাখোয়াজ-মাদল, ঢাক-তবলা, ঢোল-কাড়ানাকাড়া, তাসা-একতারা ও এমনি আরও কত শূদ্র-ব্রাহ্মণ বাদ্যযন্ত্রকে যে তিনি একাসনে বসিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। শুধু তাই নয় অধিকন্তু সেই যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে কণ্ঠসংগীতকেও তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভুবন ছেয়ে-ফেলা সে সুরের আলো, গগন বেয়ে-চলা সে সুরের হাওয়া এবং 'পাষান টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে' বয়ে-যাওয়া সুরের সে সুরধুনীকে সংস্কৃতির চূড়ান্ত পরিচয়পত্র বলে স্বীকার করতে বোধকরি কেউ-ই দ্বিধা করবেন না। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে একথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, উচ্চমার্গের সংস্কৃতি নীচের তলা থেকেই পরিস্রুত। সেখানে লোকসংগীতের যন্ত্র একতারাও অপাংক্তেয় নয়। আসলে পরিস্রুতিই সংস্কৃতি। কিন্তু সেটা লোক সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। চারুকলা প্রসঙ্গে টি. এস. ইলিয়টের মন্তব্যেও

তার পূর্ণ সমর্থন মেলে। তাঁর মতে চারুশিল্প লোকশিল্পেরই একটা পরিশোধিতরূপ—তার পরিপন্থী নয়। কিন্তু শিল্পই হোক, আর সংস্কৃতিই হোক, তার বৃন্তে যখন সৌন্দর্যের ফুল ফোটে, তখন তার মূলে থাকে বীর্য। কারণ শিল্প-সংস্কৃতি কেবল মনের ব্যাপার নয়, কর্মের ব্যাপারও বটে। ফলে লোকশিল্প, লোক-সংস্কৃতি বলে যা চলে আসছে তার অধিকাংশই কিন্তু শ্রমাশ্রয়ী। "গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা"—কাব্য হলেও কাব্যিক উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, ঐতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল ভারতবর্ষকেই ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে, তার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কত বিভিন্ন রকমের লোকশিল্প ও লোক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এগুলি আকস্মিকও নয়—বাতিকও নয়—বরং স্বাভাবিক এবং আত্মিক। এগুলি গড়ে উঠেছে কাজের বেগে আবেগ মাখিয়ে, কর্মকে শিল্প করে। জীবিকার তাগিদে মানুষকে অবশ্যই কাজ করতে হয়। কিন্তু ঐখানেই সে থেমে থাকে না—থাকতেও পারে না। সে চায় তার ওপরে উঠতে, কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের উর্ধ্বায়ন ঘটাতে—তার প্রাত্যহিক কর্মকে শিল্পকর্ম করে তার আত্মার সংস্কার করতে। এমনি করেই তার কৃতি সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, সংস্কৃতি-সংজ্ঞার ইতিহাসে তার নজির বোধহয় সুদুর্লভ। 'আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা ঐতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।' শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে, নিজেকে ছন্দোময় করাও যা, আত্মার সংস্কার সাধনও তাই। এই করেই মানুষ সংস্কৃতিসম্পন্ন হয় এবং ম্যাথিউ আরনল্ডের ভাষায় তার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা আসে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সংস্কৃতির প্রকাশ শুধু সৌন্দর্য-সুধায় নয়—বীর্যের আগুনেও। নতুবা সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে যারা ইতিহাসে বরেণ্য হয়েছেন, তাঁরা কিসের জোরে দুঃখের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য মানুষের হাতে যুগে যুগে মার খেলেন—অথচ মরলেন না, মানুষের দরজায় এসে আতিথ্য চাইলেন—পেলেন না, অথচ সেই ক্ষমা-সুন্দর চাওয়ার আজও অবসান ঘটল না।

এখন প্রশ্ন হ'ল সংস্কৃতি কি পরিবর্তনশীল? এর উত্তরে সহজেই বলা চলে যে, সমাজ যদি পরিবর্তনমান হয়, তাহলে তার সংস্কৃতিও যুগে যুগে ভোল বদলাতে বাধ্য। এর অন্যতম উদাহরণ পাই প্রাক্-শিল্পবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর যুগকে ধরলে। পূর্ব সীমা পর্যন্ত জন্মাবধি তাঁতির ছেলে তাঁত, কুমোরের ছেলে

চাক, কামারের ছেলে হাপর এবং চাষীর ছেলে লাঙ্গলকে তাদের গৃহস্থালীর একটা বিশেষ অঙ্গ হিসাবেই দেখে এসেছে। তারপর কর্মরত বাপমায়ের স্নেহ-সান্নিধ্যে বড় হতে হতে সাগ্রহে তাদের কাজে ভাগীদার হয়ে হয়তো অজ্ঞাতসারেই সে তার জীবন ও জীবিকাকে মিলিয়ে নিয়েছে। এই ঘরোয়া আবহাওয়ার মধ্যে বসে কাজ করতে করতেই তাঁতের সঙ্গে তার আঁতের মিল ঘটেছে। ফলে গলায় গান এসেছে—হাতেও রঙ লেগেছে। এমনি করে বয়ন বয়নশিল্পে, মাটির তৈরী কলসী সড়া মৃৎশিল্পে উন্নীত হয়েছে, জেগে উঠেছে লাঙ্গলের ফলায় লক্ষ্মী, হাপরের আগুনে লখিন্দরের লৌহ-মন্দির। প্রাক-বিপ্লব যুগের লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্পের সূতিকাগার এখানেই। আবার এখান থেকে পরিস্রুত হয়েই সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের চরমোৎকর্ষ ঘটল—দেখা দিল তার শাশ্বতরূপ। অতঃপর বিপ্লবোত্তর যুগে বড় বড় কারখানা গড়ে উঠে মানুষকে ঘরছাড়া করল—জীবনের সঙ্গে তার জীবিকার ছন্দঃপতন ঘটাল, কারখানা হয়ে উঠল তার কাছে কারাগার এবং চিত্ত-প্রসাধনের পথ বুঝিবা চিরতরে রুদ্ধ করে দিল। শিল্পবিপ্লবে মানুষ পেল অনেক। কিন্তু সেই সঙ্গে যে সে অনেক দিল—সে খতিয়ানও তাকে মরণান্তিক দুঃখ পেয়ে করতে হল একদিন। আত্মস্থ হয়ে তাকে বলতে হল,—উদরপূর্তি করাই আমার সব নয়—আমি বুক ভরাতে চাই—মন ভরাতে চাই—শুধু প্রাচুর্য নয়, মাধুর্যও আমার কাম্য। কিন্তু ফেরার পথ যে রুদ্ধ। তাই নূতন কর্মকাণ্ডের মধ্যে বসেই সে তার শিল্প-ব্রহ্মাণ্ডকে আবিষ্কার করতে বসে গেল। এখানেও ইতিহাসের সেই অমোঘ নিয়ম। প্রথমে সংস্কৃতির অপরিশোধিত-রূপ পরে পরিশোধিত হয়ে তার চরম আত্মপ্রকাশ। সুতরাং বিপ্লবোত্তর যুগে পপ, সঙ, টুইষ্ট নাচ, হিপিছাট, মিনিকাট্, অবোধ্য দুর্বোধ্য সাহিত্য—এক কথায় সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি—এমনকি অনাসৃষ্টি যদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলেও উন্নাসিক হয়ে অবজ্ঞায় তাকে ঠেলে দেওয়া সমীচীন হবে না। সমীচীন হবে ওর মধ্যে দিয়েই ওর ওপরে কিভাবে ওঠা যায় তার সাধনায় ব্যাপৃত থাকা—সমীচীন হবে বাচ্যকে আশ্রয় করে বাচ্যাতীত হওয়া এবং সেই বাচ্যাতীতকে ধরে রাখা ও তাকে ছড়িয়ে দেওয়া ভাবীকালের মানুষের মধ্যে।

ইতিহাস বলে এই ধরে রাখা ও ছড়িয়ে দেওয়ার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য মানুষ যুগে যুগে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে আমরা সেই বাচ্যাতীত-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে মনে করি, তার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হল পুঁথি দিয়ে—পুঁথি যার প্রতিবিম্ব সেই সমাজ ও তার কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করে। অথচ সংস্কৃতির মূল কাণ্ডটা হল সমাজ এবং সমাজ-অনুস্যূত কর্মকে নিয়ে। সংস্কৃতি ঘটে মূলতঃ করার মধ্য দিয়ে—পড়ার মধ্য দিয়ে নয়। অবশ্য পড়ার জন্য পুঁথিরও দরকার আছে—দরকার আছে সংস্কৃতির ইতিহাসকে ধরে রাখবার জন্য। কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিলে যেমন শিক্ষার্থীর হিতে বিপরীত হয়, তেমনি আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে পুঁথির বাঁধনে বাঁধলেও সোনা ফলে না। সোনা ফলে যদি শিক্ষালয়ে প্রক্ষোভ-প্রসাধনের প্রচুর ব্যবস্থা থাকে। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রক্ষোভের প্রসাধন ও প্রসাদন করাই হল আসল শিক্ষা এবং তার ফলেই মানুষ সংস্কৃতির অধিকারী হয়। শিক্ষার্থীর জীবনে প্রক্ষোভ বহু ও বিচিত্র। এই সব প্রক্ষোভের উপর লোক সংস্কৃতির প্রভাব সাধারণতঃ গভীর ও ব্যাপক বলে এগুলিকে সংস্কৃত করবার জন্য বিদ্যালয়ে বহুল পরিমাণে বহু বিচিত্র লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীর বহু বিচিত্র মৌলিক প্রক্ষোভসমূহ বিক্ষোভ-সমুদ্র পার হয়ে এসে একটা প্রশান্ত আত্তীকৃত ও সুসংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যসৃষ্টির উৎস মূলেও বোধ করি এই রকম প্রক্রিয়া বর্তমান। আসলে সকল সার্থক সৃষ্টিরই মূল সূত্র এটি। আবেগ জাগে বর্ষায়—'সোনার তরী'র গান ওঠে ফাল্গুনে। সে যাই হোক, এই প্রসাধিত শান্ত সমাহিত ও আত্তীকৃত প্রক্ষোভের অধিকারী হতে পারলেই মানুষের কর্ম শিল্পে, কামায়ণ দেবায়ণে, জীবন মহাজীবনে উন্নীত হয় এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সেগুলি শাশ্বতী সংস্কৃতি হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সংস্কৃতি সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকেও বদলাচ্ছে এবং আরও বলেছি যে শিল্পবিপ্লবোত্তর-যুগ মানেই যন্ত্রের যুগ। ভাল হোক বা মন্দ হোক, এর পক্ষে থাকি বা বিপক্ষে থাকি আমরা একে বাদ দিতে পারি না। আজ যদি ভারতবর্ষে আরণ্য-সংস্কৃতির পরিবর্তে যান্ত্রিক-সংস্কৃতি এসে থাকে, তাহলে সেটাই আমাদের সানন্দে গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি মানে পরিশীলিত পরিস্রুতি। তাকে জ্ঞান দিয়ে ধরতে হয়, কল্পনা দিয়ে রাঙাতে হয়, কর্ম দিয়ে অনুশীলন করতে হয়। নির্জীব যে যন্ত্র তাকেও গ্লানিমুক্ত না করলে সে যেমন অসাড় হয়ে পড়ে, তেমনি সজীব যন্ত্র যে মানুষ তারও সংস্কারের প্রয়োজন হয়—তার জন্য প্রয়োজন হয় যন্ত্রী এবং যন্ত্রশালার।

বলা বাহুল্য এ যুগের সেই যন্ত্রী ও যন্ত্রশালা যথাক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষালয়। এখান থেকে এঁদের হাত দিয়ে যারা বেরিয়ে আসবে, তারা শুধু সাহিত্য-সংগীত-কলা-বিজ্ঞানেই কৃষ্টিসম্পন্ন হবে না অধিকন্তু সমাজের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রেও দক্ষ কর্মী বলে পরিচিত হবে। এদের দেখব হাটেমাঠে ঘুরে বেড়িয়ে পুরাকালের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে—গিরিদরীঅরণ্যানীর নিঃসীম নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে নিজ নিজ সাধ্য ও শক্তিমত কাব্য, ক্যামেরা বা তুলির টানে ধরে রাখতে, আবার কখনও দেখব আপন বসতবাটীর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে ততোধিক সংকীর্ণ একফালী পড়ে থাকা জমির মধ্যে ফুল ফুটিয়ে, ফল ফলিয়ে তার মানসিক সীমানা বাড়িয়ে দিতে। যে যন্ত্র তাদের ঘর ও বাইরের মধ্যে একদিন বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলেছিল, ব্যবধান ঘটিয়েছিল তাব প্রাত্যহিক কর্ম ও আত্মিক ধর্মের মধ্যে, সেই যন্ত্রের সঙ্গেই তার মনের মন্ত্র মিলিয়ে দিযে সে আজ বেঁচে থাকবে নূতন সংস্কৃতির প্রজাপতিরূপে। কিন্তু কোথায় সেই শিক্ষক—কোথায় সেই শিক্ষালয়? বিদেশের কথা জানি না। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে সে রকম শিক্ষক বার বার এসেছিলেন এবং সে রকম বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু শতাব্দীর ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-বিদ্যালযে তার বাস্তব নিদর্শন আবার আমরা পেতে পাচ্ছি। উন্নাসিকেরা কবির এই ইস্কুলকে কাব্য-গন্ধা বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলেও আসলে এটি একটি কঠিন কাব্য। অবশ্য একথা ঠিক যে, বর্তমানে শান্তিনিকেতনের আনন্দ পাঠশালা থেকে পাঠভবন পর্যন্ত যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত, তাঁর রূপায়ণের মধ্যে আজ যদি কোনো ফাঁক কারও চোখে পড়ে, তাহলে সে দোষ কবির নয় আমাদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচীর কাঠামোটা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, শিশুদের মৌলিক প্রক্ষোভের সংস্কার সাধনে তিনি কোনো ত্রুটি রাখেন নি। কবি-প্রতিভাসৃষ্ট বাণী দিয়ে তিনি যেমন বাণী-বিগ্রহ রচনা করে গেছেন, তেমনি সার্থক শিক্ষাচিন্তা দিয়ে এমন একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা শাশ্বতী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টিধর্মী কামার, কুমোর, কৃষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ তিনি যেমন রেখে গেছেন তেমনি উৎসব-আসর-সজ্জা, নৃত্যগীত-চিত্রাঙ্কনেও যাতে তারা সানন্দে হাত লাগাতে পারে তার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করে গেছেন। পুঁথি অবশ্যই আছে কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজেরও যোগ আছে। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃতি পাঠ বা সমাজপাঠ কেবল পুঁথিতে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রসারিত হয়েছে

বিভিন্ন ঋতুর বাস্তব পর্যবেক্ষণে—লতাপাতা-ফলমূল-ঝিনুক-সামুক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে—শিক্ষামূলক ভ্রমণে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সার্থকে ও সত্যকার সম্মিলিত সমাজ-জীবন-যাপনে। এখানকার পুঁথি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এখানকার বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে ও আনন্দযজ্ঞে সুনিয়ন্ত্রিত নিমন্ত্রণ পায়। মানুষ সংস্কৃতি-সম্পন্ন হয়ে উঠবে অথচ কর্মের মধ্য দিয়ে তার সংস্কার হবে না—এমন স্বপ্ন দেখা নিছক ভাবালুতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এমন স্বপ্ন কোনদিনই দেখেন নি। তাঁর স্বপ্নে সংস্কৃতিসম্পন্ন যে মানুষের ছবি ছিল, সে মানুষ শুধু মগুজে মানুষ বা কাগুজে নয় - সব মিলিয়ে হাতপাওয়ালা কেজো মানুষ—গোটা মানুষ। এই গোটা মানুষ ভাতও রাঁধে আবার চুলও বাঁধে। বলা বাহুল্য সেই ধারা এখনও এখানে অনেকখানি অব্যাহত। এমন কি বর্তমান বিশৃঙ্খলার শতঘ্নী প্রহারেও সেই ধারা এখনও শতধা বিভক্ত হয়ে যায় নি। সমাজ-জীবন-যাত্রায় —"যার যেথা স্থান খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান"—নীতি যদি কোঁনোও বিদ্যালয়ে থাকে, তাহলে তা এখনও এই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাতীর্থেই বেশী পরিমাণে আছে। সুতরাং সে তীর্থকে রক্ষা করতে—যুগোপযোগী সংস্কার করে তাকে শাশ্বতী সংস্কৃতির পীঠস্থান করে তুলতে আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরই এগিয়ে আসা উচিত, বিশেষ করে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষান্তে সত্যকার কিছু যদি তাঁরা অন্তঃ-করণের দ্বারা অন্তঃকরণে গ্রহণ করে এখান থেকে চলে যান, তাহলে তাকে শুধু ঘোষিত করলেই চলবে না—প্রেষিতও করতে হবে—করতে হবে প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—তবেই তাঁদের ঋণ মুক্তি ঘটবে এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রশিক্ষার মানসচিত্রও দেশের এবং দশের কাছে বাস্তব মানচিত্র হয়ে উঠবে।

চিঠির উত্তর

ভাই শ্যামল, তুমি লিখেছ যে, অমিত মাষ্টার মরে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, অমিত মরেনি—মরেছ তোমরাই। তবু যদি ভেবে থাক যে, তোমরা বেশ বহাল তবিয়তে আছ, তাহলে বলি যে—ভবিষ্যতে তোমরাই মরবে। কারণ দুর্যোগের রাতে যে পথ দেখায়, অসহিষ্ণু হয়ে তাকে মারলে শেষ পর্যন্ত যে পথের নিশানাই হারিয়ে যায়—এবং পিছনকার যাত্রীদল যে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে সেকথা বোধ করি তোমার অজানা নয়। তবু বলি, অমিতের এই ধরণের মৃত্যু আমায় মর্মাহত করেছে। কারণ অমিতের ইতিহাস তুমি না জানলেও আমি জানি। তোমার মনে আছে বোধহয় যে, আমরা তিনজনে একই বৎসরে বি. এ. পাশ করেছিলাম। তারপর আমরা দুজনে যখন হন্যে কুকুরের মত কলকাতার সরকারী বে-সরকারী অফিসগুলোর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঠিক সেই সময় বাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। রাতারাতি অফিস পাড়ার দরজাগুলো প্রশস্ত হয়ে উঠল, গজিয়ে উঠল সিভিল সাপ্লাই, এ. আর. পি, এমনি সব কত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ব কুরুক্ষেত্রে মানবতা রক্ষায় সেই ধর্মযুদ্ধে—এটা অবশ্য যুদ্ধবাজদের ভাষা—কানাখোঁড়া, নুলোহাবা সকলের ডাক পড়ল। আর আমরা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহা-পাশ-করা গ্র্যাজুয়েট—হয়ে উঠলাম ক্ষত্রকুলসিংহ।—সিভিল সাপ্লাই অফিসার হিসাবে আমরা নিলাম সৈনাপত্য—রণাঙ্গনে না হোক গৃহাঙ্গনে তো বটেই। ইতিমধ্যে অনার্স গ্র্যাজুয়েট আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছাত্র অমিত কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সেই সঙ্গে আমিও। হ্যাঁ ভাই সত্য বলতে দ্বিধা নেই—সৈনাপত্য আমার পোষালো না। পরে অমিতের খোঁজ পেয়ে তার পরামর্শেই একটা অখ্যাত ইস্কুলে মাষ্টারী নিলাম। অবশ্য এর জন্য সেদিন আদৌ বেগ পেতে হয় নি। কারণ সেদিনে সব ইস্কুলেই বুড়ো মাষ্টার আর বুড়ো কেরানীর দলই শুধু পড়েছিল—যেমন পড়ে থাকে হাটের শেষে খদ্দের-না-জোটা কানা-কুঠো দু-একটা বেগুন। হ্যাঁ, অমিতও ঐ রকম একটা ইস্কুলে মাষ্টারী পেয়েছিল। তবে আমি যেটা নিয়েছিলাম সংশয়ে ও দ্বিধায়—সেটা সে নিয়েছিল নিঃসংশয়ে এবং নির্দ্বিধায়। তবু বলব যে, সিভিল সাপ্লাই অফিসের পাপ থেকে নিজেকে

রক্ষা করতে পেরে সেদিন আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। আর অমিতের তো বলতে গেলে জন্মান্তর ঘটেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হলেই সে বলত, রণাঙ্গনের সৈনাপত্যের চেয়ে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের সৈনাপত্য কোনো অংশেই কম নয় ভাই। রণাঙ্গন একদিন শান্ত হবে কিন্তু আমাদের প্রাঙ্গণ কোনোদিনই শান্ত হবে না—এই কথা বলে প্রাণ খোলা হাসিতে সে ঘর ভরিয়ে দিত। যাক সে কথা, বহুদিন পরে শ্রীরামপুরে সেই র্যাশন্ শপ্‌টার সামনে যেদিন তোমায় দেখলাম সেদিন সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। তোমার বাঁ-হাতে ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ্ সিগারেটের টিন, ডান হাতের দু-আঙ্গুলে আলতো-করে-ধরা ওরই একটা ধূমায়মান অংশ—পরেনে ঝক্‌ঝকে ছুরির-ফলার-মত ইস্ত্রি-করা দামী সুট, মুখে খই-ফোটানো ইংরেজী-বাংলা-হিন্দী মেশানো বুকনি,—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত করজোড়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা পেটমোটা সেই দোকানের মালিক,—এই সব কিছু মিলে তোমার পদগৌরব তারস্বরে ঘোষণা করছিল। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই কণ্ঠে এক বিচিত্র স্বরগ্রাম তুলে—হ্যাল্‌লো বলে আমায় সম্বোধন করলে। কোন ফাঁকে যেন অমিতের খবরটাও একবার জানতে চেয়েছিলে। কিন্তু যখন খবর দিলাম যে, সে মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে পঁচিশ টাকার একটা মাষ্টারী পেয়ে মনের আনন্দে আছে, তখন কণ্ঠে আবার এক বিচিত্র স্বরগ্রাম তুলে বললে, মাই গড্, লেখাপড়ায় ভাল হলে হবে কি: অমিতটা একটা রাম গবেট্। যুদ্ধের বাজারে কেউ ইস্কুল মাষ্টারী নেয়। পরক্ষণেই তোমার জিপখানা ধুলো উড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। রাম গবেট্‌ই বটে! নইলে ইস্কুল মাষ্টারী করবার জন্যে ঘরে-বাইরের গঞ্জনার বুলেট নিশ্চয়ই তার গায়ে বিঁধত।

তারপর হল কি জান? যুদ্ধ থেমে গেলে অনেক রথী-মহারথীকেই আবার ফিরে আসতে হ'ল। এমন কি প্রবল প্রতাপান্বিত এস ডাট্ অর্থাৎ শ্যামল দত্ত, তুমিও ফিরে এলে—প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মত—বিরুদ্ধ পরিবেশে অগতির গতি সীমিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। কিন্তু কি আশ্চর্য, জীবতত্ত্বের নিয়ম উপেক্ষা করে সেই বিরুদ্ধ পরিবেশে তোমরা বেঁচেও রইলে—তবে শিক্ষক হয়ে নয়—শিক্ষক-কাম্-ইনসিওরেন্স্ দালাল বা শিক্ষক-কাম্-শাইলক্ হয়ে। অবশ্য "শিক্ষক"এর সঙ্গে দালাল বা শাইলক শব্দ জুড়তে আপত্তি থাকলে, বলতে পার শিক্ষক-সনাথ জীবনবীমা প্রতিনিধি বা শিক্ষক সনাথ কুসীদজীবী তবে তাতে তোমাদের বহর বা বাহার কোনোটাই বাড়বে না। আবার এঁদের যাঁরা নিছক

শিক্ষকতাকেই আশ্রয় করলেন—তাঁদের কাছে বিদ্যালয় হল বিশ্রামাগার—আশ্রম হল শিক্ষার্থীদের নিজ আলয়—অথবা নিজেদের গৃহ-সংলগ্ন এক ফালি বারান্দা। জান তো আশ্রমের গোড়ার কথা হল শ্রম।—তা এই শ্রমই তাঁরা দান করতে লাগলেন এইখানে বসে—নাম যার প্রাইভেট টুইশন্। হিন্দু সন্তান তুমি—দশাবতার প্রভৃতির কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। মনে না থাকলে মন দিয়ে এই কাহিনীটা শোনো। অমিত যে স্কুলে মাষ্টারি করত সেখানে এই তিন শ্রেণীর শিক্ষক ছাড়াও আর এক শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন—যাঁরা পার্শ্ববর্তী পল্লী অঞ্চলের সাঁওতালদের টাকা দাদন দিয়ে দশ আনা ছয় আনা বখরায় শুয়োরের ব্যবসা করতেন,—অবশ্য গোপনে। কিন্তু তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি গোপন থাকে নি। কারণ এক একটা শূকরীর প্রসব ক্ষমতা তুমি নিশ্চয়ই জান। একটা শূকরী পোষা মানে—একপাল শুয়োর—তার মানে অদূরে ভবিষ্যতে এক রাশ টাকা। এই শ্রেণীর শিক্ষককে নিঃসংশয়ে বরাহ-অবতার-উপাসক বলা হয়। কিন্তু গোল বাধল অমিতকে নিয়ে। কারণ সে ব্যাঘাত ঘটাল তাদের বিশ্রামে ও ব্যবসায়ে। শিক্ষকদের এক সভায় সে ঘোষণা করল যে, শিক্ষকতা গ্রহণ করে শিক্ষকতা না করা চরিত্রহীনতা। বলেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে সত্য—কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আজ যদি শিক্ষক সম্প্রদায় চরিত্র গৌরবে গরীয়ান না হন, তাহলে আগামীকালে কতকগুলো মেরুদণ্ডহীন নাগরিকই তাঁদের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসবে। ভাবীকালের ইতিহাস সে অপরাধ ক্ষমা করবে না। সভা শেষে প্রাজ্ঞ একজন শিক্ষক বলেছিলেন, ব্রাদার বলে ভাল এবং ভাষাও চমৎকার। পরে জনান্তিকে এক সহকর্মী সহকর্মীকে বলেছিলেন—হেঁ হেঁ হেঁ! চরিত্রহীনতা! সিভিল সাপ্লাই অফিসে যখন চাকরী করতাম, তখন প্রত্যেক রাতে পার্টিতে গিয়ে জলপথেই যে টাকাটা পাচার হয়ে যেত, তার হিসাব দিলে অমিত মাষ্টারের মাথা ঘুরে যাবে। হেঁ হেঁ হেঁ ইস্কুল মাষ্টারের আবার চরিত্রহীনতা! আরে বাবা! চরিত্রহীন হতে গেলে চাঁদির জোর থাকা চাই—ট্যাকের জোর থাকা চাই—ট্যাক ট্যাক করে কথার চকমকি ঘষলেই সেটা হয় না। অথচ অমিত ভেবেছিল যে, তার আবেগ-উচ্ছল এই ভাষণের পর এবার সহকর্মীদের প্রশংসা-প্রশস্তি তার মাথায় বৃষ্টি ধারার মত ঝরে পড়বে। কিন্তু পড়ল যেটা সেটা বৃষ্টি নয়—সমবেত শিক্ষকদের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি। অবশ্য অমিতের সেদিকে খেয়াল ছিল না। কারণ কি জান! কারণটা হল এই যে,

অজ্ঞের অবজ্ঞা এবং বিজ্ঞের উপেক্ষার প্রতি উদাসীন থেকে অমিত নিজে পড়াত এবং ছাত্রদের পড়াত—ছাত্রদের গৃহকাজ করতে দিত এবং পূজারীর নিষ্ঠা নিয়ে সেগুলি দেখে দিত। এমন কি প্রয়োজনে বিনা বেতনে কোনো কোনো ছাত্রকে তার বাড়ীতে গিয়ে পড়িয়েও আসত। আচ্ছা তুমিই বল ভাই—শিক্ষক হয়ে কি শিক্ষকের এই সব অমার্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করা যায়? এ যে একেবারে ভাতে ঘা—ভাতে মারবার ব্যবস্থা, গণতন্ত্রের যুগে দল ছেড়ে, জনতা ছেড়ে—একজনের জন হয়ে ওঠার চেষ্টা। অতএব শুরু হল চরিত্র-হননের অভিযান এবং সমবেতভাবে। বলা বাহুল্য, সেটা অমিতকেই কেন্দ্র করে। একমাত্র প্রধান শিক্ষক সে অভিযানে না দিলেন সায়, না নিলেন অংশ। কিন্তু গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তো বড় কথা। সুতরাং বাহাত্তুরে বুড়ো হেড্ মাষ্টারকে বাদ দিয়ে এবং তাকে গোপন করেই এগিয়ে চলতে লাগলেন শিক্ষক নামধারী একদল হিংস্র শ্বাপদ—নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে।

অতঃপর আরও কিছুদিন পরের ঘটনা। শিক্ষকদের এক সভায় প্রধান শিক্ষক একদিন ঘোষণা করলেন—আজ দুটি শুভ সংবাদ আপনাদের জন্য এনেছি। এক, অমিতবাবু ইতিহাসে ডকটরেট্ পেয়েছেন। তাঁর সহকর্মী হিসাবে আমি এর জন্য গর্ব অনুভব করছি এবং তাঁর এই সারস্বত গৌরবের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস—আপনারাও সকলেই এই আনন্দ আমার সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নেবেন। দ্বিতীয় খবর হল—আগামী মাসের পয়লা তারিখে আমি অবসর নিচ্ছি। তবে আমার পরম সান্ত্বনা এই যে, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমি বুকের রক্ত দিয়ে এত বড় করেছি, আজ এর শীর্ষস্থানে এমন একজন ছাত্রদরদী নিবেদিত-প্রাণকে রেখে যাচ্ছি যাঁর বিদ্যাবত্তা ও সেবাপরায়ণতা সন্দেহাতীত। আশা করি এ সংবাদে আপনারা সকলেই সুখী হবেন। তাঁরা সুখী হয়েছিলেন বৈকি—নাহলে সভাশেষে পরিবেশিত সুস্বাদু আহার তাঁদের মুখে বিস্বাদ লাগল কেন? এবার তুমিই বল—এর পরও কি অমিতকে না সরিয়ে তাঁদের চোখে ঘুম আসে? না—আসে নি। সুতরাং অমিতকে কেন্দ্র করে তার চরিত্র-হননের অভিযান এতদিন গোপনে গোপনে চলছিল—সেটাই পরদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হল। মাহেশ ইস্কুলের চারটে প্রশস্ত দেওয়াল সেদিন পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ। সারা শ্রীরামপুর জানল—প্রধান শিক্ষক অমিত বাবু চরিত্রহীন! অতএব শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্র সকলেই সোচ্চার হ

উঠলেন—প্রধান শিক্ষক অমিতের অপসরণ চাই। হলও তাই। যাক সে কথা। চিঠি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবার শেষ করি।

তোমার চিঠির আদ্যোপান্ত পড়ে যা বুঝলাম, তাতে মনে হয় যে—অমিতের এই অবমাননার খবর তুমিও পেয়েছ এবং অপসারণকেই তুমি মৃত্যু বলে উল্লেখ করেছ। অবশ্য এক হিসাবে এটা মৃত্যুই বটে। কারণ মানীর মান রক্ষিত না হলে, গুণীর গুণ মর্যাদাভ্রষ্ট হলে—তার মৃত্যুই হয়। তবু বলব, অমিতের এ মৃত্যু সাময়িক। কারণ তাঁর মত মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পেয়েও মরে না—বরং নূতন করে নূতন পরিবেশ গড়ে তুলে সে যেমন নিজে বেঁচে ওঠে, তেমনি অপরকেও বাঁচায়। এঁরা আঘাতে সংহত হয়, অভিভবের মধ্যে পায় বিভূতি।

কাব্য করছি না—দার্শনিক তত্ত্বও আওড়াচ্ছি না। তার বড় প্রমাণ এস্ ডাট্ অর্থাৎ শ্যামল দত্ত—তুমি। নতুবা যে অমিতকে রাম গবেট বলে একদিন উপহাস করেছিলে—সেই তুমিই আজ অমিতের এই অপসারণে দুঃখিত হলে কেন? কেন এতদিন পরে এই খবরটা প্রধান করে আমায় জানালে? এ থেকেই বুঝতে পারছি যে—এ অপসারণে তাকে সিংহাসনে বসিয়েছে—এ মৃত্যু তাকে দিয়েছে এক নবীন জীবন। আশা করছি, তোমার পরবর্তী চিঠিতে সেই খবরটাই প্রধান হয়ে উঠবে।

ইতি—তোমার বন্ধু

ও-দেশের শিক্ষার রূপ ও স্বরূপের শ্রুতলিখন

ভূ-তত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন—জাগতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে নাকি ভূ-পৃষ্ঠে ভাল-মন্দ অনেক কাণ্ডকারখানাই ঘটতে থাকে। তারই ছোঁয়া লেগে কিনা জানি না, তবে দেখা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠবাসীর মানসিক আবহাওয়াতে মাঝে মাঝে পালাবদল হয় এবং তার ফলে সমগ্র মানব-সমাজেও ভাল-মন্দ কাণ্ড-অকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপার ঘটতে থাকে। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে, লঙ্কাকাণ্ডের মত প্রকাণ্ড অকাণ্ড ঘটবার সময়েও বিধাতা পুরুষ দু-চারজন মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট করে সংসারে পাঠিয়ে দেন। নতুবা তাঁর সাজানো বাগান যে শুকিয়ে যায়। যাঁরা স্বেদ-পুলক-কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী—তাঁরা বলে থাকেন—ভাব জো কি। লীলাময়ের এটিই তো লীলা-রহস্য। অহো! কি দুর্দৈব। পাষণ্ডরা এটুকু বুঝতেও অক্ষম। অন্যদিকে সমাজতত্ত্ব-বিদেরা তুড়ি মেরে বলে ওঠেন—ধ্যুৎ! ও-সব ছোঁয়াছুঁয়ি বা লীলা-রহস্য-টহস্য নয়। এ-হ'ল নির্ভেজাল আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার ব্যাপার। এখানে তার-তম্য ঘটলে দেশ-বিদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি সব কিছু পাল্টে যায়—আরও তলিয়ে যদি বুঝতে চাও তো মানব সমাজের ইতিহাস পড়। দুর্ভাগ্য আমার যে, ভূগোল পাঠে আমার মাথায় গোলমাল বাধে। মনস্তত্ত্বে অস্বস্তি বোধ করি, লীলা-রহস্যকে অসার যাদুস্পর্শ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না এবং সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস আমাকে যথাক্রমে সংবিৎহীন বা বেহুঁশ করে ফেলে। তথাপি এই অবস্থাতেও একটা ব্যাপারে সর্বদা আমাকে হুঁস রাখতে হয় অর্থাৎ না বুঝেও বোঝার ভান করে চলা আর কি! নতুবা যে "পদে পদে বিপদ ঘটে।" তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। এতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ উপকার করে আমার অন্নটা আপনারা মারবেন না—এই আশাটুকু নিশ্চয়ই করতে পারি।

পেটের দায়ে শিক্ষকতা করতে হয় এবং যেহেতু এ-ব্যাপারে শিক্ষকের সচেতন থাকা অর্থাৎ দেশবিদেশের শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্ত আবশ্যক, সেই সঙ্গে সঙ্গী-সাথীদের কাছে শলা-পরামর্শ নেবার জন্য প্রায়ই আমাকে তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু হা হতোস্মি। আমি যেখানে আপজা

দেখি, এঁরা সেখানে অন্ধকার দেখেন। তথাপি একটা বিষয় এঁদের কাছে স্পষ্ট যে, (কি করে যে সেটা তাঁদের কাছে স্পষ্ট হল তা অবশ্য তাঁরা বলেন নি) শিক্ষার রূপ ও স্বরূপ, সমস্যা, তপস্যা এবং সাধনা ও সিদ্ধিকে যদি জানতে হয় তাহলে এই অনুন্নত ভারতবর্ষে থাকলে চলবে না, যেতে হবে শিল্পসমৃদ্ধ অতি উন্নত ইউরোপে। ওঁদের মধ্যে আবার একজন তো গলায় জোর দিয়েই নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, ভারত তথা অনুন্নত দেশগুলি যখন নিরক্ষরতার কালরাত্রি অবসানের জন্য প্রহর গণনা করছে তখন সেখানে শিক্ষাচেতনা সকল স্তরে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড তেজে জ্বলছে। বলা বাহুল্য—আমি এই প্রহর-গণনা দেশেরই একজন অধম অধিবাসী। ফলে এঁদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে—হ'ল আশা ইউরোপ দেখিব অন্ততঃ, তোমার শিক্ষার রূপ চর্মচক্ষে মোর। কিন্তু দেখা আর হয় নি এবং এ জন্মে হয়তো আর হবেও না। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—না হয়েছে ভালই হয়েছে। একে তো বিংশ শতকের বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে নানাবিধ আরোগ্য দুরারোগ্য যাপ্য অযাপ্য বাঙ্গিক অর্থাৎ বঙ্গদেশ জাত দৈহিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক ব্যাধিতে ভুগছ, তার উপর আবার সমুদ্র বা আকাশ পাড়ি দিতে গিয়ে যদি সামুদ্রিক বা আকাশিক ব্যাধির কবলে পড় তাহলে শেষকালে গঙ্গাপ্রাপ্তির অভাবে তোমার স্বর্গপ্রাপ্তিতেও বিপত্তি ঘটতে পারে। ইহকাল তো খুইয়ে বসে আছ—পরকালটা আর মাটি করো না। তবু "সে যে মানে না মানা"। এতাদৃশ অবস্থায় যখন ক্রমাগত বিসদৃশ হয়ে উঠছি, তখন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বহুদিন ধরে বহু ক্লেশ করে ইউরোপের সব কটি দেশ পাড়ি দিয়ে বহুদিন পরে স্বদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেন। লোকপরম্পরায় শুনতে পেলাম যে, ওদেশের কথা শোনাবার জন্য তিনি ধৈর্যশীল শ্রোতার সন্ধানে যত্রতত্র ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন এবং সন্ধান না পাওয়ায় পেট-গুড় গুড় রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর এবম্প্রকার মানসিক মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার এক ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে গেল। মণিকাঞ্চন সংযোগ আর বলে কাকে! উহুঁ, উপমাটা ঠিক লাগসই হল না—বরং বলা চলে ভক্ত-ভগবানের সাক্ষাৎ হল, ঠিক তাই। কারণ একজন চায় বলতে, যাকে বলে অনর্গল স্রোতে এবং চতুর্মুখী বাতে—এবং অন্যজন অর্থাৎ আমি চাই শুনতে যাকে বলে কান পেতে এবং একটুও এপাশ ওপাশ না করে একেবারে এক কাতে। সুতরাং তিনি বন্ধু হলেও—এখানেতে সখ্যরস একান্ত অচল, চলে যাহা—দাস্যরস ভক্তের সম্বল। যাই হোক কাহিনী শুরু হল—বন্ধুবর মোর কহে শুনে পুণ্যবান।

কিন্তু হল কি মশায়, না—শুনে পুণ্যার্জন করে সুখ হল না। ইচ্ছে হ'ল শ্রুতকে লিখিত করে পুণ্যার্জন করি। কিন্তু এই ইচ্ছেটাই গোল বাধাল। কারণ বন্ধুবরের কাছে শোনা ও-সব দেশের শিক্ষার রূপ ও স্বরূপ, সমস্যা ও তপস্যা ভাব ও বিভাব লিখতে আরম্ভ করে দেখলাম যে, ওর জন্য অন্ততঃ দ্বাদশটি বেদব্যাস, (অবশ্যই আমার হিসাব এটি) এবং তদুপযুক্ত গণেশঠাকুরের প্রয়োজন। সুতরাং হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লাম। ঠিক এই সময়ে মনে পড়ে গেল আমাদের গ্রামের এক পুরুত মশায়কে। মনে আছে গ্রামের যাবতীয় পূজা-পাবণ আচার-অনুষ্ঠানের ফর্দ তিনি করে দিতেন এবং সেটা করে দিতেন এমন ভাবে যাতে কোনো মর্ত্যবাসী গৃহস্থই না সেই ফর্দভুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। ফলে অনুষ্ঠানকালে ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যখন উপচারের অভাবে অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠতেন, তখন স্মিতহাস্যে অভয় দিয়ে তিনি বলতেন,—"মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" হল শাস্ত্রের বিধি, ব্যাস। গৃহস্থ নিশ্চিন্ত, কারণ এই শাস্ত্রের ব্যাপক বিধি দেখিয়ে মর্ত্যবাসী-স্বর্গবাসী সবাইকেই যে কাবু করা যায়। কিন্তু মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থাপত্র দিলেও—সেই পুরুত মশায় মূল্য ধরে নেবার বেলায় মধুর মূল্যই আদায় করে নিতেন। তবে দুর্ভাগ্য আমার এই যে, কচের মত বিদ্যেটা আয়ত্ত করে নিলেও সেটা প্রয়োগ করতে পারি না সব সময়ে। সে যাই হোক, মন্ত্রটা মনে মনে আওড়াতেই যেন ভেল্কি বাজি শুরু হয়ে গেল। দেখি গোটা ইউরোপ তথা সমগ্র প্রতীচী দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ওর একদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর অন্যদিকে মুখ নামিয়ে বসে আছে ওখানকার শত সহস্র ছিটমহল। কিন্তু এবার মন্ত্রশক্তি শিথিল হয়ে আসছে। কারণ এই দু-ভাগের যে-কোনো বিভাগের শিক্ষাবৃত্তান্ত লিখতে গেলেও যে বেদব্যাসীয় অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এই সময়ে দেখা দিলেন ইউক্লিড্। বললেন—যে সকল বস্তু এক বস্তুর সঙ্গে সমান—তারা পরস্পর সমান—আমার এই সূত্রটা এবার কাজে লাগাও। দেখবে প্রতীচীর ঐ দু-ভাগের যে কোনো বিভাগের যে কোনো একটি দেশের শিক্ষাবৃত্তান্ত লিখতে পারলেই সেই বিভাগের সবকটি দেশের শিক্ষামূর্তি তার ভিতর-বার নিয়ে তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, চাই কি—সেই সঙ্গে তাদের জীবন-জ্যামিতিও ধরা পড়বে। গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজে তিনি অন্তর্হিত হলেন, আমিও সদ্যোজিতের মত কীর্তন শুরু করে দিলাম! তবে এটুকু সংবিৎ ছিল যে,

আপাততঃ আমার কীর্তনে মাত্র পাঁচটা পালাই থাকবে। অতঃপর সে কীর্তনে যদি রসাভাস ঘটে, তাহলে সহৃদয় শ্রোতৃবৃন্দকে হরিধ্বনির পরিবর্তে 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' উচ্চারণ করতে বলব। তবে গুড় দিয়ে মধুর মূল্য যে চাইব না একথা নিশ্চিত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে অন্যান্য দেশের মত প্রতীচ্যের উন্নত দেশ-গুলিরও শিক্ষার মূল কথা হল, সংযোগ-সাধন—সংযোগ-সাধন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে। এবং তার স্থান বিদ্যালয়—বাহন পাঠ্যসূচী, কার্যসূচী এবং এমনি আরও কত কি। কিন্তু এ তো হ'ল সদর মহলের ব্যাপার—অন্দর মহলে প্রবেশ করলে চোখে পড়বে যে, সে বিরাট কর্মযজ্ঞে একটা দেশের অর্থনীতি, সমাজ-নীতি—তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং মানসিক সত্ত্বা সব কিছু যোগ দিয়েছে। তবে সাহিত্যের বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনাকে বুঝতে হলে যেমন বাচ্যার্থকে ধরে অগ্রসর হতে হয়, কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরঙ্গকে দেখতে হ'লেও তেমনি তার বহিরঙ্গকেই প্রথমে ধরতে হয়। বস্তুতঃ এইভাবেই একটা দেশের স্কুল-বিল্ডিং থেকে বিদ্যালয়বেদীতে, সদর থেকে অন্দরে এবং দেহ থেকে তার আত্মায় পৌঁছানো সম্ভব।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, বিশ শতকে যে ভূ-ভাগের শিক্ষা-সচেতনতা এত তীব্র ও তীক্ষ্ণ, উনিশ শতকেও সেই ভাগের অন্তর্ভুক্ত ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্সেও শিক্ষা শুধু থ্রি আরস-এ অর্থাৎ শতকিয়া-কড়াকিয়া এবং সামান্য কিছু লিখন-পঠনেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে শিক্ষার সঙ্গে সরকারের দায়িত্বগত যোগসূত্র বোধ হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ত না। দরিদ্র-নারায়ণকে অন্নদান করে বড়লোকেরা যেমন পুণ্য সঞ্চয় করেন, তেমনি বিত্তহীন সম্প্রদায়ের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে পুণ্যার্জন কামনার বশেই হয়তো ও-দেশের ধনী সম্প্রদায় স্থানে স্থানে বিদ্যালয় বসিয়েছিলেন। তবে নাকি প্রাণের দায় বড় দায়। সুতরাং শিল্প-সমৃদ্ধির ফলে যখন ওদেশে বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ উঠল অথচ তার আশ-পাশ থেকে বস্তির অস্তিত্ব লোপ পেল না, বরং সেখান থেকে কুশিক্ষায় কুৎসিৎ চীৎকার প্রাসাদবাসীর মুখের আহার এবং চোখের ঘুমকে যথাক্রমে বিস্বাদ ও বিপন্ন করে তুলল, তখন ধনী সম্প্রদায়-সৃষ্ট সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকেন কি করে। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর। শ্রমিক সমাজ ইতিমধ্যে ভোটাধিকার পেয়ে বহুল পরিমাণে রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছে। ঘুমভাঙা অজগর আজ জঙ্গম, ক্ষুধার্ত—হয়তো বা হিংস্রও।

এইভাবে ভক্তি বা ভয়ে—যে কোনো কারণেই হোক প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক করতেই হল। তুলনামূলক বিচারে উন্নত দেশগুলির এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটু আধটু রকমফের ধরা পড়লেও সাদামাঠা বিচারে তার চেহারা একই। অর্থাৎ শিক্ষা বিতরণে শূদ্র-কুলীনের পৃথক পংক্তি থেকেই গেল। এমন কি সরকারী স্বীকৃতি পাবার পরও শিক্ষাক্ষেত্রে কৌলীন্য প্রথা লোপ পেল না। আসলে জাতিভেদ প্রথা, তা সে যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন—সহজে মরতে চায় না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষাকে রাখা হল দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাখা হল বিত্ত-কুলীন সম্প্রদায়ের ভোগে এবং যতটা পারা যায় বিবিধ উপচারে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে অজগরের ঘুম ভেঙেছে। অতএব বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডে অতি দ্রুত তালে শিক্ষার পট পরিবর্তন হতে লাগল। প্রমাণ ১৯৩১ সালের হ্যাডো রিপোর্ট এবং ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সঙ্গে এক নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রে বাঁধা পড়ে।

জার্মানীর দিকে তাকালেও দেখি যে, ১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেও কোনো 'কমন্ এলিমেণ্টারি স্কুল' ছিল না। মাত্র ঐ সালেই ওয়েমার কনস্টিটিউশন্ সমাজের নীচের তলার মেধাবী ছাত্রদের জন্য মাধ্যমিক এবং তৎপরবর্তী শিক্ষাস্তরের সোপান গড়তে সচেষ্ট হয়। শিক্ষার এই দ্বৈতাবস্থা—অর্থাৎ সমাজের উপর এবং নীচের তলার শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনা ফ্রান্সেও চালু ছিল। মাত্র সেদিন ১৯৫৯ সালে 'বার্থয়িন্ রিফর্মস'-এর বলেই শিক্ষাক্ষেত্রে পারিবারিক আভিজাত্য বৌদ্ধিক আভিজাত্যের নিকট নতি স্বীকার করল। তবে এদিক থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার যথার্থ সন্তান যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার বাহাদুরি আছে বটে। এর বড় প্রমাণ তার কমন্ স্কুল। এই স্কুলের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে—সে প্রতিষ্ঠান ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এখানে অন্ত্যজ-কুলীন ধনী-দরিদ্র তীক্ষ্ণধী-মন্দধী সব শিশুকেই একাসনে বসতে হবে। এক কথায় এটি সত্যসত্যই আপামর সাধারণের প্রতিষ্ঠান। শ্রেণীগত অর্থগত উচুনীচু ভূমিকে সমভূমি করে যে সব "কমন্ স্কুল" এদেশে গড়ে উঠেছে, তার ভাল-মন্দ নিয়ে বিচার অবশ্যই চলতে পারে। কিন্তু সে ভাল-মন্দের ভাগীদার কোনো একজন নয়—বহুজন অর্থাৎ দেশের সরকার। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের মানুষের নাড়ীর যোগ আছে। অন্যদিকে রাশিয়ার দিকে চোখ ফেরালে

একেবারে তাজ্জব বনে যেতে হয়। প্রথম নিকোলাসের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল দ্বৈতবাদ—অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা চাষাদের আর মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল খাসাদের। অতঃপর ১৮৬৪ সালে আইন করে সরকারী সাহায্যপুষ্ট 'মডেল্ স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তার একশো বছর পার হ'তে না হ'তেই—১৯১৯ সালে ইউরোপীয় সভ্যতার শেষ জাতক রাশিয়া সব ছেলেমেয়েদের জন্য সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 'পলিটেক্নিকাল্ এডুকেশন' প্রবর্তন করে সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে দিলে।

শিক্ষাব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থার দিক থেকে একে এক কথায় বলতে পারি সর্বহারাদের সব পাইয়ে দেবার আয়োজন। নীতিগতভাবে এটি মার্কস-লেনিনপন্থী, যার মূল কথা হ'ল শিক্ষার ভিতর দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলা। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুন বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে উঠতে পারলেও অখ্যাত পল্লী অঞ্চলে সেটি করে উঠতে পারে নি। ফলে সে সব অঞ্চলে ও-পর্ব চার বৎসরের একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে যাই হোক, বিশ শতকে ও-কটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, তার প্রণালী, প্রসার ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের কাছে যেন এক একটি বিরাট বিস্ময় চিহ্নের মত। কারণ বিশ শতককে ওদেশে, বিশেষ করে, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—এলেনকি'র কথায় বলা হয়ে থাকে—শিশু শতক এবং সেটা সত্যও বটে। প্রমাণ হ্যাডো রিপোর্ট। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুতি মাত্র নয়, বরং সেটিকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির উদ্বোধক করে তোলাই হবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম কাজ। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষায় এই কাজই অব্যাহত গতিতে চলছে। অন্যদিকে আমেরিকাও "প্রগ্রেসিভ্ মুভমেণ্ট"কে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মনুমেণ্ট হিসাবে স্থাপন করেছে। এর মূলকথা হ'ল কর্মকেন্দ্রিকতা, স্বতঃস্ফূর্তি এবং বিদ্যালয়-অঙ্গনের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ-প্রাঙ্গণের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই প্রগতিবাদ আজ ইউরোপের সর্বত্র প্রসারিত। ফ্রান্সের "নিউ স্কুল"-এও দেখি, শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষুধা বুঝে খাদ্য এবং ওজন বুঝে ভোজনের ব্যবস্থা চলছে। এতো বাহ্য। আরও একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখি যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য

দেশগুলির যেন একটা পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য প্রাণোচ্ছল স্বাধীনতার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত শাসন-সংহত সংযমের—ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ-পরিধির সঙ্গে বৌদ্ধিক এবং মানসিক আভিজাত্য-তুঙ্গতার। —এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তাবিশিষ্ট জাতিগত মানসতার প্রশ্ন।

অন্যদিকে রাশিয়ায় ১৯১৯ সালে যুগান্তকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনা হলেও সেখানকার ছাত্র-সমাজ অশান্ত হয়ে উঠে। তবে কি প্রগতিবাদী শিক্ষার রন্ধ্র দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার শনি রাশিয়ায় প্রবেশ করছে? ফলে ১৯১৯-১৯২৯ পর্যন্ত সময়রেখার মধ্যে স্তালিন-বাদকে দৃঢ় করবার জন্য বহিরাগত প্রগতিবাদী শিক্ষাধারাকে সেখানে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিপ্লবোত্তর অশান্ত রাশিয়ায় হয়তো এর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু সে কথা থাক। ইতিমধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহহারা মা-বাপহারা অপরাধপ্রবণ দাগী দুষ্টদের নিয়ে অখ্যাত এক প্রাইমারী স্কুলের ততোধিক অখ্যাত এক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এক নূতন ধরণের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে মেতে উঠলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই শিক্ষকের নাম এ্যান্‌টন্ সেমিওনোভিচ্ ম্যাকায়েংকো। তিনি দেখালেন, শিক্ষা নামক কর্মযজ্ঞটি সুসম্পন্ন করতে হলে চাই যৌথ দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্র সকলকেই নিতে হবে—নিতে হবে একান্ত নিষ্ঠায়। ভাবতে হবে যে, এই যজ্ঞের সার্থক উদ্‌যাপনের উপরই জাতির উন্নতি-অবনতি বর্তমান-ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ছাত্র-সমাজকে সার্থক নাগরিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে ওদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার বা অজস্র স্নেহ কোনোটাই কাম্য নয়—কাম্য যুক্তিসহ নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের কঠোরতা এবং সেই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান-নিষ্ঠা। বিদ্যালয়ের আচার-আচরণ পঠন-পাঠন খেলাধূলার প্রতিটি স্তরেই যেন তারা উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরোধ কাম্য তো নয়ই বরং এই দুয়ের মধ্যে একটা আন্তরিক মিল আছে। তারা যেন প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝতে পারে যে, সমষ্টিগত কল্যাণে ব্যষ্টিগত উন্নতি যেমন হয়, তেমনি ব্যষ্টিকেও সমষ্টিগত কল্যাণ কামনায় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্তালিনবাদ প্রগতিবাদকে দেশছাড়া করতে চাইলেও সেটি রাশিয়ায় পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে কর্মঠ-বৃত্তি, তা সে শিক্ষাক্ষেত্রেই হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক বেশী দিন চলে না। শিক্ষা ও

সমাজ পরস্পরের পোষ্টা হিসাবে কাজ করে আত্ম-সম্প্রসারণের পথে এগিয়েই চলে।

এ তো গেল প্রাথমিক শিক্ষার কথা। এবার ওদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনা করতে গিয়ে যে ব্যাপারটা সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে, তা হল এই যে, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সেখানে একটা পালাই একটু আধটু অদল-বদল করে সব আসরে অভিনীত হয়ে আসছিল। সেই প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং তার প্রবহণকল্পে পাঠ্যসূচীতে প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের প্রাধান্য। সেই তথাকথিত বিত্তকুলীন এবং রক্তকুলীনকে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক করে রাখবার প্রয়াস এবং সমাজের অন্ত্যজদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলবার জন্য তথাকথিত অভিজাতদের সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ইংল্যাণ্ডের কি পাবলিক বা গ্রামার স্কুল, ফ্রান্সের কি লিসিজ বা কলেজ, জার্মানীর কি জিম্‌ন্যাসিয়েম্ বা রাশিয়ার কি জিম্‌ন্যাসিয়া সর্বত্রই ঐ একই পালা। সহজ কথায় প্রাথমিক শিক্ষা শূদ্র বা অস্পৃশ্যদের জন্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্রাহ্মণ বা সমাজের মধ্যমণিদের জন্য। কিন্তু শীঘ্রই পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কা লাগল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে। এক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব বোধ করি জার্মানীর প্রাপ্য। কারণ সেদেশে রিয়েল্, জিম্‌ন্যাসিয়েম্ প্রভৃতি যে তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই পালাবদলের ফলে গড়ে ওঠে, তাতে প্রাচীনের সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত, বিদেশীভাষা এবং ইতিহাস প্রভৃতি আধুনিক বিষয়বস্তু ছাড়পত্র পায়। অন্যদিকে যে প্রেরণায় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় একদিন 'কমন্ স্কুল' গড়ে উঠেছিল—সেই প্রেরণাতেই বিশ শতকের প্রথম পাদের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপিত হল কমপ্রিহেন্‌সিভ্ স্কুল। অবশ্য একথা ঠিক যে, এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বিচ্ছেদ কখনও ঘটেনি, বরং এ দুয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতাই ছিল তার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পার্থক্যই হল এইখানে।

কালস্রোত বয়ে চলে—পরিবর্তনের তরঙ্গও ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সাল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-আইন মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক বিষয়গুলির পঠন-পাঠনের জন্য গ্রামার স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল এবং মডার্ণ স্কুলের প্রতিষ্ঠাও হল। অবশ্য এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে ১১+এ শিক্ষার্থীদের একটা কঠিন

পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এটিও উল্লেখ্য যে, সেখানে লেবার পার্টির প্রভাবে এই পরীক্ষা-প্রাবল্য ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে এবং বেশ কিছুদিন থেকে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (এল্ ই. এ.) অনেক ক্ষেত্রেই সে পরীক্ষা উঠিয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে ফ্রান্সে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লিসিজ্ বা কলেজে নেপোলিয়ন-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই চলে আসছিল। তবে ইতিমধ্যে ছাত্রদের বেতন রহিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কলেজেস্ মডার্ণেস্ প্রভৃতিও স্থাপিত হয়েছে। তবু যেন মনে হয় ও-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা আভিজাত্যিক উন্নাসিকতা আছে। প্লেটো দর্শন-সুলভ ভাবমার্গ-আশ্রয়ী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠনের দিকে যেন তার বিশেষ প্রবণতা। তাই দ্য গলের সময়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স চোদ্দ থেকে ষোলোতে তুললেও এবং প্রাচীন ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক এবং কারিগরি বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটালেও ও-দেশের মাধ্যমিক স্তরকে প্রাথমিক স্তরের ঠিক স্বাভাবিক পরিণতি বলে ধরা যায় না। সংক্ষেপে ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও বুদ্ধিভিত্তিক আভিজাত্যিক পরীক্ষাকেন্দ্রিক এবং আধুনিক শিক্ষা পরিভাষায় অগণতান্ত্রিক। জার্মানীতেও তাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ও-দেশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নই ছিল। তবে ওয়েমার রিপাবলিক'এর সময় (১৯১৯—'৩৩) এই বিচ্ছেদ কাঠিন্যকে বহুলাংশে শিথিল করা হয় এবং প্রাচীন সংস্কৃতি অপেক্ষা আধুনিক সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করা হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থায় নেমে আসে নৈরাজ্য। কিন্তু অতি শীঘ্রই সে অবস্থার অবসান ঘটিয়ে আট বা নয় বৎসরের বাধ্যতামূলকভাবে ফুল টাইম্ এডুকেশন এবং আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পার্টটাইম্ এডুকেশন এর ব্যবস্থা সেখানে গড়ে ওঠে। জার্মান জাতির প্রাণশক্তির এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত, এক আশ্চর্য গৌরব। যুদ্ধের অপদেবতা মানবজাতির অনেক অকল্যাণ করেছে, মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে তার কপালে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে তাকে মৃত্যুর মুখে বরাবর ঠেলে দিতে চেয়েছে। মরণান্তিক সে দুঃখ—সর্বগ্রাসী সে অকল্যাণকে আপন বলে অপসারিত করেছে। নতুবা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ইংল্যাণ্ড ১৯৪৪ সালের যুগান্তকারী শিক্ষা আইন পাশ করে কি করে—কি করেই বা জার্মানীতে 'ওয়েমার রিপাবলিক'-এর শিক্ষাব্যবস্থা জনসাধারণের সানন্দ স্বীকৃতি পায়—কি করেই

বা বহু শক্তিশেলে আহত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী সমগ্র জাতির প্রাণসঞ্জিবনী-স্বরূপ শিক্ষা-বিশল্যকরণীর সন্ধান পায়। অকল্যাণের অপদেবতাও কি মাঝে মাঝে উপসর্গহীন হন—তাঁর হাত থেকেও কি ভুলক্রমে উদার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে নতুবা এক একটা যুদ্ধের সঙ্গে বা তার অব্যবহিত পরে শিক্ষার পটপরিবর্তন হয় কেন—কেন ঘটে তার প্রগতি? রাশিয়াতেও দেখি, বলশেভিক্ বিদ্রোহের পর সেখানে শ্রেণীহীন শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার খোল-নলচে পাল্টানো হচ্ছে। এর জন্যে স্থাপিত হ'ল 'ইউনিফায়েড্ লেবার স্কুল' বা 'ইউনিফায়েড ওয়ার্কাস স্কুল'। এছাড়া শ্রমিক সম্প্রদায় থেকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মী গড়ে তোলবার জন্য 'র‍্যাবফ্যাক্স' এবং কমিউনিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত করবার জন্য 'পাওনীয়ারস্' এবং 'কমুসোমল্' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে দেশের যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রগতিবাদী শিক্ষার বিভিন্ন ধারা এসে মিলছে। মিলছে রাশিয়ার জীবন-স্রোতের সঙ্গে এক হয়ে—স্বাঙ্গীকৃত হয়ে। অর্থাৎ শ্রেণীহীন শিক্ষা কাঠামোর ভিতর দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন এবং শ্রমিক ও শ্রমের পূর্ণ মর্যাদাদান, রাশিয়ার এই দুটি আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দেশ বিদেশ-আশ্রিত শিক্ষা-ধারাকে সেখানে নিজস্ব করে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম দিকে যখন সেখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হল তখন দেখি যে 'ইউনিফায়েড স্কুলগুলি' 'পালিটেক্নিকাল্ স্কুলে' রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের মূল কথা হল—বিজ্ঞান চর্চা। ফলে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে চলছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত চর্চার বিপুল আয়োজন। এইভাবে ১৯১৭ সালের নবজাতক ১৯৬১ সালে সম্পূর্ণ সাবালক হয় সজোরে ঘোষণা করে বসল—মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত করা, রাশিয়া তথা কমিউনিষ্ট জগতের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র সহজ করে দেওয়া এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় তাদের দক্ষ করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে তোলা। বলা বাহুল্য যে, এই ধারাই আজ ক্রমোন্নতির পথে। কিন্তু একথা কি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সে-পথে শিক্ষায় সম-সুযোগ সম-অধিকারের মন্ত্রটি সম্পূর্ণ সোচ্চার! অবশ্য সে মন্ত্রের অর্থ যদি হয় আপামর সাধারণের জন্য একই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা, তাহলে সেটি বোধ হয় বহুল পরিমাণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রবর্তিত। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডে

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও কখনই ওদেশ শিক্ষা-সাম্যকে শিক্ষা বলে মনে করে নি। অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রীক্ষেত্রীয় একাকার ওরা মানতেই চায় না। ফ্রান্সের মুখপাত্র হিসাবে এডওয়ার্ড হেরিয়ট্ তো সেদিন প্রকাশ্যেই বললেন—শিক্ষায় গণতন্ত্র বলতে যদি সব মানুষকে সমস্তরে নামিয়ে আনা হয়, তাহলে আমি তার দলে নেই। বরং তার বিরোধিতাই করব আমি। আমরা চাই শিক্ষার ভিতর দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত সৌরভাস্বর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিক আভিজাত্যে সৃষ্টি করতে। অথচ সে আভিজাত্য যে সমাজের সকল স্তর থেকেই আসতে পারে একথা মানতেও তিনি আদৌ রাজী নন। অন্যদিকে জার্মানী শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখালেও আসলে ইংল্যাণ্ডের মত ওরাও তলে তলে দ্বৈতবাদী। তাই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত শিক্ষার দুটি ধারা উপরতলা আর নীচেরতলা এখনও সেখানে প্রবহমান। পরিশেষে যে রাশিয়া তার সমাজকে চষে খুঁড়ে সমভূমি করে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র তৈরী করছে বলে দাবী করে—সেখানেও নাকি শিক্ষায় ছুতমার্গ একেবারে পরিত্যাজ্য হয়নি। অন্ততঃ কু-লোক এইরকম কুৎসাই রটায়। অপরদিকে সু-লোকে বলে রাশিয়া যা করেছে বলে দাবি করে, সেটি সঠিক কিনা এখনও যাচাই করে দেখা হয়নি। তবে হ্যাঁ, শিক্ষা-সাম্য ব্যাপারে ওরাই যে সবচেয়ে বেশী জোরে হরিধ্বনি দেয়—সেটা সত্য।

বন্ধুবর তো তাঁর "অমৃত-সমান" কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি ভেবে চলেছি! ভেবে চলেছি বিশ শতকের শিশু-শতক-অভিহিত ইউরোপকে। আর ভাবছি কবে ভারতবর্ষের সকল শিশু মনস্তত্ত্বের গবেষণা লব্ধ আলোকে শিক্ষিত হবে। দীক্ষিত হবে, আনন্দ-উজ্জল স্বাস্থ্য-পরমায়ু-যোগানো সমাজ-সেবার মন্ত্রে, কবে ভারতবর্ষ তার সুদৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে আদর্শ কল্যাণকামী রাষ্ট্র হয়ে উঠবে—কবে সে বুঝবে মানব জমিতে শিক্ষার আবাদ করলে সত্যই সোনা ফলে। বন্ধুবরের শেষ কথাটি এখনও মনে পড়ছে—কোনো জাতিকে যদি জাতে উঠতে হয় তাহলে চাই শিক্ষা। উত্তরে সায় দিয়ে বলেছিলাম—এতে কি দ্বি-মতের অবসর আছে। উৎসাহিত হয়ে বললেন—তবে কি জান, সে শিক্ষার সার্থক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ যদি করতেই হয়, তাহলে তোমাকে বলতেই হবে—ইউরোপ তুমিই আমার ইউরেকা। সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি নি। পরে ভাবতে বসেছিলাম, সত্যই কি তাই? ১৯৬০ সাল। রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক অভিযান—প্রযুক্তি বিদ্যার পরম বিস্ময়।

সারা ইউরোপে হৈ হৈ পড়ে গেল—বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৬০ সাল, "প্রেসিডেণ্টস্ কমিশন্ অন্ ন্যাশান্যাল্ গোলস্" ঘোষণা করলেন, অতঃপর বিজ্ঞান দেবীর পায়ে আরও অর্থ ঢালো, যাতে তিনি আরও খুশী হয়ে এদেশের প্রযুক্তি বিদ্যাকে আরও প্রসারিত করেন, এদেশের স্বাস্থ্য সম্পদকে আরও বাড়িয়ে দেন। খুব ভাল কথা—এমন ঘোষণাকে সাধুবাদ না জানাবে কে। কিন্তু ঘোষণা এখনও শেষ হয় নি। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে শুনল—হ্যাঁ, তাঁর পায়ে আরও অর্থ ঢালো, যাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দেবী-প্রসাদে সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ঘোষণার মধ্যে অবশ্য "ত্রিভুবন জয়ী হও" কথাটা শোনা যায় নি—কিন্তু অনেক সময়ে যা অনুচ্চারিত, তাই যে বেশী সোচ্চার হয়ে ওঠে—যা কানে শুনি, তাই যে বড় হয়ে মনকে বড় করে শোনায়। আমার ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষণার পর থেকে সমগ্র ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানসিক বা আত্মিক সাধনা অপেক্ষা সামরিক শক্তি সাধনাকেই বড় করে দেখা হচ্ছে। সেই ম্যারাথন রেসে গোপনে গোপনে ধনতন্ত্রবাদ পুঁজিবাদ প্রকট হয়ে উঠছে। এক একটা সাপ যেমন এক একটা জন্তুকে প্রথমে সম্মোহিত করে পরে তাকে গিলে ফেলে, তেমনই ধনবাদের বেদীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বসিয়ে কপট সাধনায় তাঁকে তুষ্ট করে তাঁরই প্রসাদপুষ্ট হয়ে ওরা বোধ হয় এখন সামরিক শক্তিকেই শিক্ষার পরমোৎকর্ষ বলে ভাবতে শুরু করেছে। আশঙ্কা হয় অদূর ভবিষ্যতে কলাবতী সরস্বতীকে ও-দেশ ভীষণাকৃতি ধূমাবতীতে রূপান্তরিতা না করে ক্ষান্ত হবে না। তারপর দেখা দেবে আকাশ-জোড়া কালো ধোঁয়া—মানুষ মেতে উঠবে মরণ-আলিঙ্গনে, হয়তো তখনই দেবীকে অপাত্রে বরদানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—ছিন্নমস্তা হয়ে—আপন রুধির আপনি পান ক'রে। কিন্তু মানবতা বলে, মাভৈঃ, আবার পুরশ্চরণ হবে, আবার হবে মন্ত্রোচ্চারণ—আবার দেবী প্রতিষ্ঠিতা হবেন তার অমল-কমল আসনে এবং তুই মানুষই তাঁকে সেখানে বসাবে।

২২শে শ্রাবণ

২২শে শ্রাবণ। ঐ স্মরণীয় দিনটিকে কেন্দ্র করে বোলপুরের কাছাকাছি একটি ইস্কুলে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক। ভাবলাম, রসিকতা নয় তো। কারণ যতদূর জানি, বর্তমানে বীরভূমের প্রায় সব ইস্কুলই আধপোড়া, নয় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত অথবা পুলিশের ব্যারাকে পরিণত। এর মধ্যে মহাকবির স্মৃতিপূত ২২শে শ্রাবণ উদ্‌যাপন অতি প্রয়োজনীয় হলেও যেন নেহাতই বেমানান। তবু যদি তা করতেই হয়, তাহলে বিস্তৃত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে সীমিত গৃহাঙ্গনেই করা ভাল। যাই হোক, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এবং সেই সঙ্গে বহুজনের সঙ্গে একাসনে ব'সে মহাকবিকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ ও সৌভাগ্য নিতে যথা সময়ে বার হলাম, 'আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে'। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছেই উল্লাস উবে গেল। বাকী রইল ত্রাস এবং সেটা "আধ" নয়—সম্পূর্ণ। অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও তাঁর আরও দু'চারজন সহকর্মীর দিক থেকে সাদর সম্ভাষণের ত্রুটি হল না। শুনতেও পেলাম মাইক থেকে তারস্বরে ঘোষিত হচ্ছে—অনুগ্রহ করে আপনারা শান্ত হয়ে বসুন--আমাদের সভাপতি এসে গেছেন—এখনই সভার কাজ শুরু হবে। প্রধান শিক্ষক ইতিমধ্যে সসংকোচে জনান্তিকে কি যেন আমায় বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু "বলি বলি বলা হল না।" দেখলাম, পূর্বের ঘোষককে সরিয়ে দিয়ে ষোল সতের বছরের এক তরুণ আরও উঁচু গ্রামে ঘোষণা করলেন—বন্ধুগণ! এ সভা অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক। কারণ প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর কয়েকজন তাঁবেদার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের একটা বিরাট অংশকে উপেক্ষা করে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সভা ডেকেছেন। বন্ধুগণ! আজ যিনি সভাপতি হয়ে এখানে এসেছেন, তাঁকে স্পষ্ট করে জানান দরকার যে, বিরাট জনমতকে উপেক্ষা করে এই সভায় সভাপতির পদ যদি তিনি অলঙ্কৃত করেন, তাহলে পরবর্তী ঘটনার জন্য মুখ্যতঃ স্বার্থ-সিদ্ধি প্রয়াসী প্রধান শিক্ষক ও তাঁর দালালরা দায়ী থাকবেন। তরুণের ভাষা চমৎকার এবং ভাষণও নাটকীয়। অতঃপর শুরু হল দক্ষযজ্ঞের পালা। ফুলদানি উলটাল, ধূপকাঠির আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে নিবে গেল—

মঞ্চের মালা ছিঁড়ল এবং সভার একপাশে রাখা তবলা নেহাৎ কাঠের প্রাণ বলেই হয়তো মুখ থুবড়ে পড়া সত্ত্বেও রক্ষা পেল। কিন্তু তার দোসর বেচারা বাঁয়া মাটির প্রাণ নিয়ে আর কতক্ষণ. যুঝবে? তাই শেষ বারের মত একটা বিকট শব্দ করে ক্ষিত্যপতেজ-মরুৎ-ব্যোমের সঙ্গে মিশে গেল। হ্যা! মাইকটা যাতে আর চেঁচাতে না পারে, তার জন্য তারও কণ্ঠস্বর চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা হল।

আমার তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। সংবাদপত্রে অবশ্য এরকম ঘটনা চা খেতে খেতে প্রায়ই পড়ি এবং সহৃদয় শ্রোতা পেলে সে সংবাদ পড়েও শোনাই। কিন্তু সেদিন যা হোল, তা পঠিত নয় এবং শ্রুতও নয়—একেবারে দৃষ্ট। শুধু তাই নয়—আর কিছুক্ষণ সেখানে থাকলে যে একাধারে স্পৃষ্ট ও পিষ্ট হব, তাও বুঝতে দেরী হল না। তবে নিজের বরাত জোরেই হোক আর মহাকবির আশীর্বাদের জোরেই হোক—খুব জোর বেঁচে গেলাম। প্রধান শিক্ষক ও তাঁর দু'চারজন সহকর্মীর কৃপায় নিকটবর্তী এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। প্রাথমিক সাদর সম্ভাষণের পর জানতে পারলাম যে, এই বৃদ্ধ গৃহ-স্বামীই ঐ ইস্কুলের সম্পাদক। মনে মনে বললাম, আশ্চর্য! এঁরই ইস্কুলে আজ অনুষ্ঠান অথচ ইনিই বাড়ীতে বসে? বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। সাদরে আমাদের বসিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আশ্চর্য হয়ে গেছেন তো—ভাবছেন অনুষ্ঠানে না গিয়ে সম্পাদক মশায় খিল এঁটে নিজের ঘরে বসে থাকেন কি করে—তাই না? দেখুন, এ দক্ষযজ্ঞ যে হবে তা আমি আগেই জেনেছি অথবা আরও প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে হলে বলা যেতে পারে যে এটি আমাকে পূর্বাহ্নেই জানানো হয়েছিল। কিন্তু সময় ছিল না আপনাকে জানাতে। তাই সম্মানিত অতিথির অসম্মান যাতে চোখে দেখতে না হয়, তার জন্তেই চোখ বুঁজে ঘরে বসেছিলাম—সভায় যাই নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন—আমাদের ক্ষমা করুন। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হোল। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রশ্ন করলেন—বলতে পারেন কেন এমন হচ্ছে- এমন হল—কেন ছাত্র সমাজের একাংশ আজ কারণে এবং অকারণে এত অশান্ত হয়ে উঠল? শুনেছি, আপনি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের একজন প্রাচীন শিক্ষক। যাঁদের হাতে এই ছাত্র সমাজের ভার ন্যস্ত করে দেবার জন্তে আপনারা বছরের পর বছর বিষয় পড়ান,- -পদ্ধতি শেখান এবং বৎসরান্তে যাঁদের ছাপ দিয়ে শিক্ষিত

শিক্ষক করে পাঠান; সেই আপনাদের সামনেই আমি আজ এ প্র রাখছি। উত্তরে জানালাম যে এ প্রশ্নটির উত্তর বহুদিক থেকে বিচার কর দেখতে হবে। এ অশান্তির মূলে আছে ছাত্রসমাজ-জোড়া হতাশা, অবশ্য সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, অতীত রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতিকেও ধরতে হবে।

ইঙ্গিতে বুঝলাম এ উত্তর বৃদ্ধের মনঃপূত হচ্ছে না। অতএব থামতে হল তিনি বললেন, মাপ করবেন, আমার ধারণা, এই বিচার হল আপনাদের পণ্ডিতি পণ্ডশ্রম, সেই বড় বড় নীতির বড় বড় ব্যাখ্যা। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, সেই সব ছাত্রদের নিয়ে যাদের বয়ঃসীমা দশ থেকে সতেরো-আঠারোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের মধ্যে হতাশা যদি এসেই থাকে, তাহলে সেটি রাজনীতি, অর্থনীতি সঞ্জাত নয়। ওসব নীতি অন্ততঃ এদের উপর বাইরে থেকেই চাপানো—বানের জলে ভেসে-আসা খড়কুটোর মত। এদের অন্তরাত্মা যা চাই "তাই কোথা পাই গো" বলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এখনও কেঁদে বেড়ায়। মন দিয়ে কান পেতে সে কান্না আমরা শুনি না বা শুনলেও তার প্রতিকারে এগিয়ে আসি না। এদের হতাশা সেই প্রত্যাশা ভঙ্গের। আমরা বড় বড় তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই —বড় বড় সমস্যার সমাধানে রাশি রাশি কাগজে যত খুশি কালি ঢালি, কিন্তু মাটির প্রদীপের মত—"আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি" বলে এদের কাছে এগিয়েও আসি না এবং সেটুকু করিও না। বৃদ্ধের আবেগ অনুভব করলাম কিন্তু তার অর্থ তখনও আমার ঠিক স্পষ্ট হল না। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—দেখুন, আমি সামান্য মানুষ একটা অতি সামান্য কথাই বলি। আপনাদের হাত দিয়ে যে সব শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী প্রতি বৎসর বেরিয়ে আসছেন তাঁরা অনেকেই বিষয়বস্তু ও তার পরিবেশ প্রণালী সম্বন্ধে দক্ষ। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে সেই পরিবেশনের জন্য যে একটা হৃদ্য পরিবেশ—একটা ঘরোয়া আবহাওয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে একটা মানসিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করা একান্তই দরকার, সেই ছোট্ট কথাটি তাঁরা অতি ছোট করে দেখেন বা আদৌ দেখেন না। এমন কি যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে এদিকে একটু-আধটু নজর দেন, তিনিও শ্রেণীকক্ষের বাইরে এসে ওসব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেন। অথচ আমার ধারণা শ্রেণীকক্ষের ঐ ঘরোয়া পরিবেশ শুধু পাঠ্যবস্তুর পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরন্তু সেটি ছাত্রসমাজের গৃহকক্ষে প্রবেশ করে তার আবহাওয়াকে কলুষমুক্ত করে, তার চিত্ত-প্রসার ঘটায় এবং কালক্রমে প্রত্যক্ষ

হয়ে সেটি আমাদের বৃহত্তর সমাজ-জীবনকেও সংহত করে। বৃহৎ বনস্পতি বিশেষ এই যে সম্পদ, তা প্রথমে ঐ ক্ষুদ্র শ্রেণীকক্ষের বেড়া ধরেই আকাশের দিকে মাথা তোলে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে-তোলা এবং হয়ে-উঠা মানসিক পরিমণ্ডলের এই হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা। অবশ্য তার জন্য শিক্ষককেও বৈরাগী হ'য়ে কারণে অকারণে শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। মাঠে-ঘাটে, হাটেবাজারে, নগরেগ্রামে, যেখানেই ছাত্রসমাজ আছে, সেখানেই ঐ বৈরাগীকে তার একতারাতে একমনে বাজিয়ে যেতে হবে—"আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।" বুড়োর কথায় যদি রাগ না করেন তো বলি—আপনাদের মত জ্ঞানী-গুণীরা বর্তমানেও শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বসে শুধু প্রণালীর বটিকাই তৈরী করেছেন এবং সেই বটিকা হাতে নিয়ে যাঁরা ইস্কুলে ফিরে আসছেন, তাঁরাও শুধু বটিকা বণ্টনেই ব্যস্ত হচ্ছেন। ফল হল দ্বৈপায়নত্ব—দ্বৈপায়নত্ব আপনাদের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণ-প্রাপ্ত সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে ছাত্রসমাজের। সে দ্বৈপায়নত্বের আত্মঘাতী ঐশ্বর্যের দম্ভে মাধুর্যের অপমৃত্যু হল।—রাজা কৃষ্ণ রাখাল কানাইকে ভুলে গেল। তাইতো সে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে বনে বনে আকুল হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে। সভাপতি মশায়! আজ আমাদের ইস্কুলে যা ঘটল এবং অন্যান্য ইস্কুলে যা ঘটছে, তা হল, শিক্ষা জগতের উভয় মেরুর সুকঠিন সাধনায় গড়ে-তোলা এবং গড়ে-ওঠা মানসিক পরিমণ্ডল-বিচ্যুত সেই অসহায় রাখাল বালকের কান্না—প্রত্যাশা-ভঙ্গজনিত হতাশার বিকৃত অভিব্যক্তি।

সপার্ষদ প্রধান শিক্ষক এবং আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু থামলেন। মনে হল অতীতের স্মৃতি-সূত্র খুঁজছেন। তারপর যেন কার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আত্মগত হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের সেই পাগলা মাষ্টারের কথা আজ খুব বেশী করে মনে পড়ছে। তিনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। আশপাশ গ্রামের লোক আদর করেই হোক আর অবজ্ঞা করেই হোক তাঁর নাম দিয়েছিল "পাগলা মাষ্টার"। পরে জেনেছি, এই নামকরণের কারণ হোল এই যে, তাঁর গোলমেলে মাথাটা ভূগোল ও তাঁর ইস্কুলের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আশেপাশের গ্রামের ছাত্র এবং তার অভিভাবকদের কাছেও মাথা তুলেছিল। কিন্তু সেকথা এখন থাক। প্রতিদিন দেখতাম, ক্লাসে ঢুকেই তিনি একবার সকলের মুখের দিয়ে সস্নেহে তাকাতেন এবং শুধু তাঁর ক্লাশের কথাই বা বলি কেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

প্রথম্ ঘণ্টাতেই প্রতিদিনের গোটা ইস্কুলের উপস্থিত-অনুপস্থিতের তালিকা নিঃশংসয় নিশ্চয়তা নিয়ে তিনি ধরে ফেলতেন। কারা উপস্থিত, কারা অনুপস্থিত, তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত নাম ধাম নিয়ে, বোধহয় কার্যকারণ সূত্র ধরেও বটে। 'হ্যাঁ বুঝেছি, হরির অসুখ করেছে—করবে না—বর্ষার নতুন জলে যা লম্ফঝম্ফ সেদিন দেখলাম! উঠিয়ে দিলে কি হবে? তাদের গাঁ থেকে ফেরার পথে আবার দেখি সে জলে নেমেছে—দিলাম পিট্টি। কিন্তু পিট্টি দিলে কি জ্বর সামলানো যায়! এখন লাগাও জলপটি কদিন ধরে—এরপর আবার পুরোনো পড়ার জন্য তার বাড়ী গিয়ে আমায় আর একবার পিট্টি লাগাতে হবে।" মুখ টিপে সবাই হাসছি আমরা ক্লাশে বসে।

গোপাল! আজ বাড়ীতে কে রেঁধে ছিলেন—মায়ের তো অসুখ—দিদি বুঝি? না মাষ্টারমশায়। মা পথ্য করেছেন তিনিই রেঁধেছিলেন। আচ্ছা, বেশ বেশ। কিসের জ্বাল দিয়েছিলেন—কেন, স্যার! কাঠ! মধু তোমাদের বাড়ীতে কিসের জ্বালানি? আজ্ঞে কয়লা। কোথা থেকে আন? জানি না স্যার। অন্য একটি সহপাঠী তখন বলে উঠেছে—কি বোকা রে! ঐতো পাশের গাঁয়ের হরি মুদির দোকানেই তো কয়লার পাহাড় রয়েছে। ঠিক কথা—কিন্তু হরি মুদী, কোথা থেকে কয়লা নিয়ে আসে? ক্লাশ চুপ করে যায়—তাই তো? সে কথাটা তো তারা কোনদিন ভাবে নি। হঠাৎ অন্য একটি সহপাঠী বলে ওঠে, স্যার! বোলপুর রেল ষ্টেশনে সেদিন বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখলাম—হরিদার দোকানে যে কয়লার পাহাড় আছে—সেখানে তার চেয়ে অনেক অনেক বড় কয়লার পাহাড়! কিন্তু সে পাহাড় যে কারা বানিয়েছে এবং এত কয়লাই বা সেখানে এল কি করে—তাতো জানি না স্যার। পাগলা মাষ্টার এবার আরও উদ্দীপ্ত, আরও উৎসাহিত হয়ে টাঙ্গালেন নিজের হাতে আঁকা একখানি মানচিত্র। তাতে মুক্তার মত লেখা—ভারতের কয়লা অঞ্চল—আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ইত্যাদি। অতঃপর সেই ঘরোয়া পরিবেশে অন্ধকার কয়লাখনি আমাদের কাছে আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। এত গেল তাঁর ক্লাশের পরিচয়! অন্যদিকে ছুটির দিনে দেখতাম—ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে তাদের ঠাকুর্দা ঠাকুমার কাছে তিনি গল্প করছেন। কি ব্যাপার—মাষ্টার। এদিকে কোথায়। আজ্ঞে! আপনাদের কাছে! ভাবলাম ছুটির দিনে কি করি—যাই একটু গল্পগুজব করে আসি। কেউ বলেন, বেশ বেশ। কেউ বা বিস্ময়ে ভ্রূ কোঁচকান—কেউবা উপেক্ষায়

পাশ কাটান। কিন্তু আদরই হোক আর অনাদরই হোক—উপেক্ষাই পান বা অপেক্ষা—পাগলা মাষ্টারের ছুটির দিনে ছুটি নেই। অভিভাবকদের ছেড়ে কখনও দেখতাম মধুর লাগানো করবী গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছেন। কি বোকা রে তুই! গোড়ার মাটি শক্ত থাকলে তোর গাছ নিঃশ্বাস নেবে কি করে—তুই পারিস নিঃশ্বাস নিতে?—বলে তার নাক মুখ একবার চেপে ধরে হো হো করে হেসে উঠলেন। গোপাল, এ্যাই গোপাল! কটা ছাগলছানা হয়েছে—দেখি, দেখি—আরে এগুলো যে একেবারে বাচ্ছা। কোলে করে নিয়ে যেতে হয়। নে নে, মায়ের দড়ি ধরে নিয়ে চল—উঁহু ছেলে ছেড়ে কি মা নড়ে? আচ্ছা—এইখানে খুঁটোটা পুঁতে দে আমি বাচ্চাগুলোকে কোলে করে এগিয়ে দিচ্ছি। এমনি করে আশপাশ গ্রামের ছাত্র এবং অভিভাবকদের তিনি কাছে টানতেন—কাছে আসতেন—বিদ্যা দিয়ে নয়—বুদ্ধি দিয়ে নয়—হৃদয় দিয়ে, হৃদয় ছুঁয়ে। তাছাড়া বিদ্যাবুদ্ধি বলতে তো তার সম্বল ছিল একখানা ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট। সে যাই হোক, এমনি করে ধীরে ধীরে ঘরে ও বাইরে তিনি আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের এখানকার সমাজজীবনে এর মূল্য যে কত সুদূর প্রসারী ছাত্রাবস্থায় সে কথা বুঝতে পারিনি। কারণ বোঝবার বয়সও তখন হয়নি। আজ বহুদিন হল তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের অনেকের পার্থিব ঠিকানাটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁরা এখনও যথার্থ সতীর্থ হয়েই আছেন। নইলে পরস্পরের আপদে-বিপদে, সম্পদে-সৌজন্যে যেকজন বুড়ো এখনও আমরা রয়েছি—তারা একে অপরের কাছে ছুটে যাই কেন? কিন্তু এখনকার ছাত্রসমাজে সেই মানসিক পরিবেশ নেই—কারণ ভূগোলের সেই পাগলা মাষ্টারও নেই। আবার বলি, আমি ছাত্রসমাজের দোষ দিচ্ছি না—রাজনীতি বা অর্থনীতির কথা বলছি না। আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয় ও তার আশপাশের গ্রামগুলির মধ্যে একটা সহজ সরল মানসিক পরিবেশ আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে না। মা যেমন করে ছেলেকে সদা সতর্ক অথচ সদা সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে মানুষ করেন,—তেমনি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলেও শিক্ষককে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ক'রে ঘরোয়াভাবে তার গোড়া পত্তন করতে হয়। আমার ধারণা ইস্কুলের ক্লাসেই সেটা আরম্ভ হ'তে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সেই ঘরোয়া আবহাওয়া পাঠদান ও পাঠকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকলেও ছাত্রছাত্রীর ভাবী সমাজ-জীবনে সেটি একাধারে

বৃহৎ ও মহৎ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আজ যাদের দেখলেন—যাদের বয়স দশ থেকে সতেরো-আঠারোর মধ্যে, তারা কোন সমাজে বাস করছে এবং কোন সমাজই বা তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য রেখে যাবে? তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত-প্রাণশক্তি বাংলার কথা শুনেছি—পানিপথ প্রান্তরে নিঃশেষিত যুব-শক্তি মারাঠা জাতির কথা জানি—দেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমূল নরনারীর নিরুদ্দেশ যাত্রাও দেখেছি। আজ আবার ইয়াহিয়া খানের দুঃশাসনে উদ্বাস্তু সমস্যা-জর্জর পশ্চিম বাংলা এবং নিরন্ন নিঃস্বত্ব বাংলাদেশকেও দেখলাম! কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুস্যূত সামাজিক, মানবিক, আত্মিক ও হার্দিক পরিবেশ-চ্যুত হয়ে বর্তমান ছাত্র সমাজে যে ক্ষত ও ক্ষতি হচ্ছে, তার তুলনা কোথায়? এই মানসিক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কবে হবে? ভগবানের দোহাই! কিছুদিনের জন্য প্রণালী-বটিকা-বিশারদ কবিরাজ তৈরী করা বন্ধ রেখে আপনাদের মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের আপনারা ঘরামি হতে শেখান। আর তাও যদি না পারেন, তাহলে অন্ততঃ নেপথ্য থেকে এমন আবহ-সঙ্গীত বাজিয়ে চলুন, যাতে করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া গড়ে ওঠে—বৃদ্ধের চোখ সজল হয়ে উঠল।

ফেরার পথে ভাবছিলাম, সুকঠিন প্রশাসন নয়, রাজনীতির যূপকাষ্ঠও নয়—দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও নয়—উদ্‌ভ্রান্ত ছাত্রসমাজের কাছে আজ সকলের চেয়ে যা বেশী দরকার, তা হল প্রশান্ত হৃদয়, যিনি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, তিনি হলেন ঐ পাগলা মাষ্টার। কিন্তু আমাদের যাঁরা শিক্ষক—তাঁদের? তাঁদের প্রয়োজন হল মন্ত্র জপ করা—এবং তাতে প্রাণ-সঞ্চার করা—কি সে মন্ত্র? কেন—আমার "যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি?"—এই মন্ত্র। উর্ধ্বে চেয়ে দেখি, ২২শে শ্রাবণের আকাশ থেকে—সেই মন্ত্রটিই শ্রাবণধারায় নিঃশব্দে উচ্চারিত হচ্ছে।

প্রতিভা-সূত্রের দর্পণে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ

'আরে রাম! রাম! এ যে গুণ করতেও শেখেনি—একেবারে জড়-ভরত'। নাতি টেনিসন্‌কে উদ্দেশ্য করে বাক্যবাণ ছাড়লেন তাঁর ঠাকুর্দা! সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন টেনিসনের মা, শরমে শঙ্কায় কুণ্ঠিত হয়ে। যাইহোক মায়েব উপরোধ-অনুরোধে ঢেঁকিগেলা গোছের মনোভাব এবং সেই মনোভাব অনুযায়ী মুখভঙ্গী করে শেষ পর্যন্ত মা-বেটার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হল।

আর একটি ঘটনা। এবারে যিনি এ দৃশ্যে নামলেন—তিনি ঠাকুর্দা নন, বাপ। ছেলে গেটেকে পাঠিয়েছেন আইন পড়তে—বাপের মনে কত স্বপ্ন, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু হলে হ'বে কি—ছেলে আইন পড়তে গিয়ে বে-আইনী কাজ করতে চায়।—বলে, বৃত্তি হিসাবে আইন-ব্যবসা অতি জঘন্য। আর যায় কোথা! বাবা যখন সরাসরি গেটেকে বেরিয়ে যাবার সোজা সড়কটা বাৎলাচ্ছেন, এমন সময় পথরোধ করে দাঁড়ালেন ছেলের মা। অবশেষে আপোষ হল, এবং ছেলের জন্য ঘরের দরজাও আপাততঃ কিছুদিনের জন্য খোলা রইল মায়ের সহানুভূতিতে। এমনি কত দরজা বন্ধ হতে হতে খুলে গেছে কেবল মায়ের চোখের জলে। তাই বালজ্যাক, রবার্ট লুইস্ স্টিভেনসন্, গেটে আজ এক একটি নাম, এক একটি ইতিহাস। অন্যদিকে অজ্ঞতার ফলে অবিবেচনার ফলে কত দরজায় যে আগল পড়েছে, কত ফুল যে পথে প্রান্তরে ঝরে পড়েছে, কে তার ইয়ত্তা করবে? এর দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, প্রতিভা যখন বাপ-ঠাকুর্দার রক্তচক্ষুর সামনে নিষ্প্রভ, তখন মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধালোকই সেই জ্যোতি ছড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতে জগতকে আলো দিয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে যে, যাঁদের প্রতিভা ভবিষ্যতে এমন দেশকালাতিশয়ী হয়, তাঁরা প্রথম জীবনে "জড়ভরত" উপাধিটা পান কেন? আমার ধারণা এঁদের পড়বার জন্য যে পাঠশালা বা পুঁথির দরকার, তার কোনোটাই মেলে না। ফলে যে পাঠশালায় যে পুঁথি থেকে এরা পাঠ নেন, সেখানে এঁরা প্রথম বেঞ্চিতে বসলেও তথাকথিত পাঠশালার ছাত্র হিসাবে এদের স্থান একেবারে শেষের

বেঞ্চিতে। প্রখ্যাত সুইস্ বিজ্ঞানী আগস্ত ফরেল্ যিনি মাত্র আঠারো বৎসর বয়সেই আবিষ্কার করেন যে, পিঁপড়ের নাকি একটা সামাজিক পাকস্থলী আছে এবং প্রয়োজন হ'লে তা থেকে খাদ্য বার করে ক্ষুধার্ত জ্ঞাতি কুটুম্বদের খাইয়ে তাদের প্রাণরক্ষা ক'রে সে পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখায় এবং সেই সঙ্গে পূর্বে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের মাত্র এক-নবমাংশ নিজের প্রাণরক্ষার্থে রেখে দেয়—তিনিও ছেলেবেলায় শিক্ষকদের কাছে ঐরকম দু-একটা জব্বর উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু না পেয়ে উপায় কি। শিক্ষকেরা তো জানতেন না যে, সে-ছেলেটি সেদিন যাওয়া-আসার পথের ধারে আল্পস্ পর্বতের আনাচে-কানাচে প্রকৃতির পাঠশালায় বসে পাঠ নিচ্ছেন, পিঁপড়ের সংসারের মধ্যে থেকে এক অনাবিষ্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধার করছেন। সেকথা জানতেন তাঁর ঠাকুরমা—তিনিই শুধু শুনতেন তাঁর সেই পাঠশালার পড়া। আসলে এ সব জাতের ছেলে নিজ নিজ জগতে বাস করে বলেই তথাকথিত পাঠশালার পরীক্ষায় পাশমার্কা-ছেলে বলে গণ্য হয় না। হীরের টুকরোকে কাচ বলে যদি কেউ ভুল করে, তাহলে সে দোষ হীরের নয়—চোখের। জহরের মূল্য জহুরীর কাছে, অন্যথায় হীরেও জিরের দরে হাটে বিকিয়ে যায়।

আবার এমনও দেখা যায় যে, প্রতিভা তার জন্মলগ্ন থেকেই জ্যোতি ছড়াচ্ছে এবং অসাবধানী লোকের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। প্রমাণ, বিটোভেন্। আট বৎসর বয়সে কন্সার্ট বাজিয়ে আসর মাৎ করলেন এবং তেরো বৎসর বয়সে যে তিনটি সোনাটা তিনি রচনা করলেন, তা আজও বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। আবার এর চেয়েও বড় বিস্ময় হলেন গ্রোটে। দু-বছর বয়সে পিয়ানো ধরে, সাড়ে তিন বছর বয়সে পিকাডিলিতে নিজের সৃষ্টি শুনিয়ে ইনি হয়ে উঠলেন সংগীত সমাজের মধ্যমণি। আমেরিকার খুদে কবি উইলিয়াম্ কালেন্ ব্রায়াণ্ট্‌ও তাই। ষোলো মাসের ছেলে ব্রায়াণ্ট অক্ষর পরিচয় শেষ করলেন, পাঁচ বছর বয়সে ওয়াট্‌সের "পোয়েমস্ ফর চিলড্রেন" আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে আবৃত্তি করে চললেন আপন খেয়ালে। তারপর শুরু হল কবিতা রচনার পালা এবং আঠারো বছর বয়সে ও তার কিছু পরে যথাক্রমে "অ্যানাটপ্‌সিস্" এবং "ওড্ টু এ ওয়াটারফাউল" রচনা করে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। রবীন্দ্র সৃষ্টির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছেও এ বস্তু দুর্লক্ষ্য নয়। সেই সঙ্গে ব্যারিষ্টার হতে গিয়ে সরস্বতীর বরপুত্র হওয়ার কাহিনীটিও ঐতিহাসিক হয়ে আছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আদৌ

অপ্রতুল নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিন বছর বয়সে গড়্গড়িয়ে বই-পড়া, পাঁচে-পা দিয়ে গ্রীক লাতিন-শেখা, আটে পড়ে "কম্পেনডিয়াম্ অফ্ ইউনিভার্সাল্ হিষ্ট্রি" রচনা করা এবং যৌবনে "এন্সাইক্লোপ্যাডিয়া ব্রিটানিকা" মগজে-পোরা ম্যাকলেকে শেষ পর্যন্ত সুধীজনের কাছে বহু ক্ষেত্রেই "ইঁচড়ে পাকা" উপাধি নিয়ে ইহধাম থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এর চেয়েও উল্লেখ্য—ব্রুক লাইন ম্যাসাচুসেট্সের ছেলে বোরিস্ সিডিস্। মাত্র ষোলো বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে বাইশ বৎসর বয়সেই তিনি গণিতের গোটা অধ্যাপক হয়ে বসলেন। সেদিন সে দেশের প্রতিটি সংবাদপত্রের শিরোনামায় তিনিই সংবাদ শিরোমণি। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখি কোনো অফিসের কেরাণীর চেয়ারে বসে তিনি জমা খরচের খাতা মেলাচ্ছেন। উপরের ঘটনাগুলো একসঙ্গে সাজালে যে কয়েকটি তথ্য ধরা পড়ে তাহল এই—এক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিভা (জিনিয়াস্) শৈশবেই ধরা পড়ে, দুই, ও তার স্বাভাবিক পথে ওর আইন মতে চলতে পায় না বলেই আপাতদৃষ্টে বে-আইনী বা বে-হিসেবী কাজ করে, তিন, প্রতিভাকে দক্ষতা (ট্যালেণ্ট) এবং দক্ষতাকে প্রতিভা বলে আমরা অনেক সময়েই ভুল করি এবং চার, প্রতিভাই হোক আর দক্ষতাই হোক সস্নেহ প্রদীপালোকে যতটা সে বস্তু ধরা পড়ে এবং ফুটে ওঠে এমন আর কিছুতেই নয়। তাই বাপ ঠাকুর্দার রক্তচক্ষু অপেক্ষা মায়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিই ও-সম্পদের স্বভাব-সন্ধানী। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সব মা-ই ধাই নয়। ফলে পোষণ ও প্রেষণার অভাবে অনেক প্রতিভা অনেক দক্ষতা যৌবনে পা দেবার আগেই অকালে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং গেছেও। মানবসমাজের পক্ষে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে সান্ত্বনা এই যে, সে ক্ষতি লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে। নতুবা মানব সভ্যতা তার ক্ষতির পরিমাণের দিকে চেয়ে আর্তনাদ করে উঠত। কিন্তু সে কথা থাক। আর্নল্ড্ টয়েনবি প্রতিভাকে "মুক্তিদাতা" বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভার এটিই একমাত্র ও যথার্থ উপাধি। কারণ সমাজের পুরোনো আচারের প্রাণহীন মরুভূমিতে প্রতিভাই ভগীরথের মত মুক্তি-জাহ্নবীকে আহ্বান ক'রে অচলায়তনের অনুর্বরতাকে শ্যামশ্রী-মণ্ডিত করে। তবে মনে রাখা উচিত যে, প্রতিভার সার্থক স্ফুরণে স্থান কাল পাত্রের মধ্যে সমন্বয় দরকার। প্রখ্যাত পণ্ডিত হার্মান এইচ হর্ন প্রতিভা বিকাশের দার্শনিক আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, প্রতিভার বাঁচা ও বাড়া নির্ভর করে সময়ের সঙ্গে

তার যুগল-সম্মিলনে। ইতিহাসও সেই এক কথা বার বার বলে চলেছে। তবে যে কথা এখনও আমরা বুঝতে পারিনি, তাহল প্রতিভা গঠনে পূর্বসূরী সমসাময়িক এবং প্রতিভাবানের অংশ কতখানি এবং ঠিক সেইভাবেই সে নিজে কতটা পথ পাড়ি দেয়, কতটা পথ সমসাময়িকদের পাব হতে সাহায্য করে এবং পরবর্তীদের প্রস্তুতির জন্যই বা কতটা পথ কেটে রাখে, তাও বলা শক্ত। কিন্তু যে কথা নিঃসংশয় নিশ্চয়তা নিয়ে বলা যায় তা হল এই যে, প্রতিভাবান একাধারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুই-ই। আশার কথা এই যে, বর্তমান শতাব্দী তার এই দুই রূপ সম্বন্ধেই সচেতন বলে তাকে স্রষ্টা হতে এবং সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, এই যে সচেতনতা সেটি বহু আযাসকৃত এবং বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পাওয়া।

নৃতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধিগত বা প্রতিভাগত বিচারে জাতিগত পার্থক্য অবান্তর। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার তুলনায় ইউরোপের যে ঔজ্জ্বল্য সেটি জীবতত্ত্বের বা নৃতত্ত্বের নিয়মে ঘটেনি, ঘটেছে এই দু-দেশের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যের ফলে। এর বড় প্রমাণ মেলে কিছুদিন আগেকার আমেরিকার পরাধীন নিরক্ষর নিগ্রো সমাজের সঙ্গে এখনকার সর্বপ্রকার স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত নিগ্রো সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে। কাব্য-সংগীতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তার দান আজ উপেক্ষার বস্তু নয়। আবার অন্যদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার কনিষ্ঠ সন্তান রাশিয়া যে এখন সব বিষয়ে জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্থান অধিকার করে নিয়েছে, সেও ঐ সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার ফলে—শাশ্বত জীবতত্ত্বের নিয়মে নয়। হ্যাভেলক্ এলিস্ তাঁর 'স্টাডি অফ্ বৃটিশ জিনিয়াস্' গ্রন্থে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন, সেখানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী-গুণীর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু এই হার ক্রমশ বেড়ে গেছে সমাজের উপরতলার দিকে। ওডিন্ ফ্রান্সের ৬২৩ জন জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী থেকে পেয়েছেন মাত্র ৯·৮ এবং সেখানেও এই হার ক্রমবর্ধমান হয়েছে উপরতলার দিকে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এটিও জীবতত্ত্বের নিয়মে ঘটেনি—ঘটেছে উপরতলার মানুষের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্যে। সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, প্রতিভা বুদ্ধি বা দক্ষতার মতই সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের একটা সহজাত সম্পদ এবং সে সম্পদের সংরক্ষণ ও সংবৃদ্ধি যথাযথ সুযোগ-সুবিধা সাপেক্ষ। আপাততঃ এই ভূমিকাটুকু মনে রেখে প্রতিভার উৎসসন্ধানে আমরা আরও একটু অগ্রসর হ'তে পারি।

সুপণ্ডিত জোসেফ্ এস্ টেইলর্ কোনো প্রসঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমান যুগের শিক্ষাতত্ত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য বিধানকেই সেরা শিক্ষা বলে মনে করে না। কারণ সামঞ্জস্য বিধান মানে সংগ্রাম—সংগ্রাম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তাতে জয়যুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ হ'ল প্রকৃতিকে মানুষের আনুকূল্যে নূতন ক'রে সৃষ্টি করা এবং মানুষের বীর্যলব্ধ কল্পনাবৃত্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত সেই সৃষ্টিকে সর্বমানবের কল্যাণে নিয়োগ করা। তাঁর মতে এই হ'ল প্রতিভা। সৃজনীশক্তি তথা এই যে প্রতিভা, প্রকৃত শিক্ষা তাকেই উন্মোচিত করে, উদ্বোধিত করে এবং পরিণামে মানব সভ্যতাকে বিবর্তন-প্রবর্তনের প্রবাহ-মাধ্যমে এক মহতী পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল—সেই প্রতিভার সংজ্ঞা কি? উত্তরে বলা যেতে পারে যে 'সাহিত্য'কে সংজ্ঞার চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ করবার প্রয়াসের মত প্রতিভাকেও সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা অনেক হয়েছে। কিন্তু যে অধরা, তাকে ধরবে কে? নীট্‌শে যেন কোথায় বলেছিলেন, যে বস্তু ইচ্ছায় আসেনা অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে সামনে দাঁড়ায়, দাঁড়ায় সৃষ্টির আনন্দের রূপ ধরে, একাধারে পার্থিব চিত্তৌদার্য ও স্বর্গীয় সুষমা এবং শক্তির মুক্তির মূর্ত বিগ্রহ হ'য়ে, সেটাই নাকি প্রতিভা। তবে কি সে—'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' তাই? না, সুবিধে হল না। কারণ এসব ভাষা দার্শনিকের বা কবির ভাষা। এ ভাষা দিয়ে যাঁরা প্রতিভাকে বুঝতে চান বা অপরকে বোঝাতে চান, তাঁরা তাঁদের পথে অবাধে বিচরণ করতে থাকুন, আমরা ততক্ষণে অন্যপথ ধরি।

মনস্তাত্ত্বিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, প্রতিভা আর যাই হোক—দক্ষতা নয়। তবে দক্ষতার মতই সে বস্তু সহজাত ও সার্বজনীন। তাহলে এ-দুটির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাঁরা মনে করেন, নদী থাকলেই যেমন তার উপত্যকা থাকবেই, অথচ উপত্যকা থাকলেই যে নদী থাকবে—এমন কোনো কথা নেই, তেমনি প্রতিভার দোসর হিসাবে দক্ষতা থাকবেই কিন্তু দক্ষতা থাকলেই যে প্রতিভা থাকবে তা বলা চলে না। বস্তুতঃ প্রতিভা যেন এক সানুবিসর্পী দুর্বার লাভাস্রোত। ওর কাজ হল পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সমাজ-সংস্থাকে ভাসিয়ে দিয়ে নূতন সমাজ গঠন করা—নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত করা। মনস্তত্ত্বের ভাষায় দক্ষতা বলতে বুঝি উচ্চস্তরের বুদ্ধ্যঙ্ক। তবে তার একটা সীমা আছে,

মাপ আছে এবং ধাপও আছে। সে তার শেষ ধাপে পৌঁছালেই—কে যেন তর্জনী-সংকেতে তাকে বলে ওঠে 'তিষ্ঠ, আর এগিও না'। আর প্রতিভা যেন বলতে থাকে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। তাই যখন তার তুঙ্গতা চোখে ধরা পড়ে না—মানবিক বুদ্ধ্যঙ্কে মাপা যায় না, তখন মনস্তাত্ত্বিককেও বলতে হয়, বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও আর একটা অঙ্ক আছে, ওটার সঠিক উত্তর এখনও কষে বার করতে দেরী আছে। তা থাক, কিন্তু সেই সঙ্গে আঁক কষতে গিয়ে তাঁরা এমন কতকগুলি চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন যে, তা দিয়ে প্রতিভার উৎস-সন্ধানে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হ'তে পারি। তাদের মতে প্রতিভার চিহ্ন হ'ল তিনটি—এক, সুবেদিতা (সেনসিটিভিটি), দুই, কল্পনা (ইমাজিনেশন্) এবং তিন, স্বজ্ঞা (ইনটুয়িশান্)। তবে মনে রাখা দরকার যে, এদের মধ্যে সঙ্গম ঘটা চাই—অর্থাৎ ত্রিবেণী সঙ্গমেই প্রতিভার পলিমাটি পড়ে এবং মানব-সভ্যতার স্থায়ী-সম্পদ গড়ে ওঠে।

অতঃপর ঐ তিন চিহ্নের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ার চেয়ে বরং দু-একটি উদাহরণ দিয়ে ওদের আবরণ উন্মোচন করা যেতে পারে। প্রতিভাবান ভল্তেয়ার বহিরঙ্গে ছিলেন একজন আত্যন্তিক উন্নাসিক। তৎকালিক সমাজ ব্যবস্থার সব কিছুতেই খুঁটে খুঁটে খুঁত বার করাই ছিল যেন তাঁর কাজ। এ যেন পাঁজিতে শুভদিন দেখতে বসে যতসব অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতিকে তুলে ধরা। অথচ অন্তরঙ্গে এই মানুষটিই ছিলেন অতি-মাত্রায় সুবেদী। সুদূর স্পেনে ভূমিকম্পের ফলে আকস্মিকভাবে শত-সহস্র জীবন দীপের অকাল নির্বাণ-সংবাদ যখন সারা ফ্রান্স আলোকজ্জ্বল ভোজনাগারে বসে যথারীতি খানাপিনা করতে করতে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন ভলতেয়ারের চোখে বান ডেকেছে—সে খবর শুনে তিনি কাঁপছেন। হ্যাঁ, জ্বর এসেছে তাঁর, বেদনা-বহ্নিজাত সেই তাপাঙ্ককে চিকিৎসক জ্বর বলেই ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। অতঃপর একাদিক্রমে সাত-সাতদিন শয্যাশায়ী থাকার পর তাঁর রোগমুক্তি ঘটল। মনস্তাত্ত্বিকরা বলে—এ ঘটনা আজও ঘটে—ঘটে সুবেদিতার জন্য। ব্যাপারটা হল এই যে, প্রতিভার সুবেদিতা লক্ষণটি হল সহস্রতন্ত্রী বীণার মত। তাই সুদূর আফ্রিকায় কালো মানুষের বুকের উপর দিয়ে সাদা মানুষের জুতোর কাঁটা চললে সে কাঁটা বাংলাদেশের কবির বুকে শেল হ'য়ে বেঁধে—যুগান্তের কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় আর্তনাদ—উচ্চারিত হয় মানব সভ্যতার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বাণী।

অতঃপর কল্পনার কাহিনী।

'ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ' শেষ হয়ে আসছে—এবার সে শেষ বলি চায়। ঔপন্যাসিক কেঁদে আকুল। তাঁর মানস-সন্তান লিটিল্ নেল্‌কে অবশেষে বলি দিতে হবে, তাঁর মণিহারকে খুলে ফেলে দিতে হবে? কিন্তু স্রষ্টা নির্মম। পরক্ষণেই দেখছি, চার্লস্ ডিকেন্স রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন বেদনা-বহ্নি বুকে নিয়ে। একেই বলে সার্থক কল্পনা—তাই তাঁর সৃষ্টিও সার্থক।

অতঃপর স্বজ্ঞার স্বরূপ সন্ধানে আমরা সাহিত্যের রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যেও যেতে পারি। সে রাজ্যে 'বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়, খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়'—এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, এমন এক সমর-কৌশলীকে যিনি সমর-শাস্ত্র-সম্মত বহু সুনিশ্চিত পরাজয়কে ঐতিহাসিক বিজয়-তোরণে পৌঁছে দিয়েছেন। যাঁরা নেপোলিয়নের জীবন-ইতিহাস গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরাই জানেন যে, জীবনে বহুবার অসম্ভবকে সম্ভব, অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করেছিলেন তিনি যে গুণে, তার মূলে ছিল প্রতিভার তৃতীয় লক্ষণ ঐ স্বজ্ঞা। এ যেন তমিস্রাবিদারী এক আকস্মিক বিদ্যুৎদীপ্তি এবং সে দীপ্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-সাহিত্য সব রাজ্যেই মেলে। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেলম্ হোৎস্ বলতেন, আমি যে চক্ষু-বিজ্ঞানে বা আলোক এবং শব্দ প্রবাহ সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য দিতে পেয়েছি, তার মূলে আছে এক অনাবিষ্কৃত রহস্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, একটা বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করবার পর আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হ'ত। তখন চুপ করে বসে থাকতাম, আর ভাবতাম বুঝিবা সমস্যা সমাধানে তপস্যা আমার ব্যর্থ হল। তারপর হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যায় বুঝতে পারিনা—এক আকস্মিক প্রেরণা আমার অজ্ঞাতসারে আবার পথ দেখায়। আপনমনে চেঁচিয়ে উঠি—ইউরেকা—পেয়েছি—সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যুগপৎ অব্যবহিতত্ব এবং পরোৎকর্ষ বা পূর্ণতাই হ'ল স্বজ্ঞার সংজ্ঞা। সে আসে—হঠাৎ আসে—আসে আলো নিয়ে। পরে দেখা যায় যে, যে হঠাৎ এসেছিল সে মিলিয়ে যায়, রেখে দিয়ে যায় আলো। এই আলোকেই আমরা বলি সভ্যতার আলো—তার স্থায়ী সম্পদ।

হয়তো এই কারণেই অনেকে এই সম্পদকে আত্মিক শক্তি বলে অভিহিত করেছেন—কেউ বা অভিহিত করেছেন দৈবী বা ঐশী শক্তি বলে। তবে নিছক বৌদ্ধিক ব্যাপার বা দক্ষতা যে এটি নয়—এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত

নেই। তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে, প্রতিভার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটিকেও নাকি পুষ্ট করা যেতে পারে এবং আমেরিকাতে নাকি এর জন্য ডাঃ সি. জি. স্যুটস্-এর অধীনে একটা 'স্কুল অফ্ ইনটুয়িশন্'ও খোলা হয়েছে। সত্য বলতে কি, জনসাধারণের শুভেচ্ছায় এই প্রতিষ্ঠানটিরও বেশ বাড়-বাড়ন্ত। সুতরাং ডাঃ স্যুটস্-এর মতামতও আদৌ উপেক্ষা করার মত নয়। তাঁর মতে এই আত্মিক সম্পদটির পোষ্টা হ'ল দৈহিক বিশ্রাম—একেবারে যাকে বলে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকা—'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।' দ্বিতীয়ত, প্রতিপাদ্য বা জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে মানসিক সচেতনতা ও একাগ্রতা। কিন্তু সেই একাগ্রতা বা সচেতনতা যেন মনকে না মাতাল করে—যেন না মনের স্থৈর্য নষ্ট করে দেয়। কিন্তু মন ভাবছে অথচ দেহ ঘুমাচ্ছে বা মন প্রতিপাদ্য বিষয়ে সচেতন রয়েছে অথচ মনের উপর চাপ পড়ছে না—এ যে বড় কঠিন সমস্যা। ডাঃ স্যুটস্ বলছেন সেইজন্যই তো আমার ইস্কুল খোলা। এখানে যে শিক্ষাশাস্ত্র আমরা গড়ে তুলেছি, সে তো ঐ সমস্যার সুরাহার জন্য। শুধু তাই নয়, এখান থেকে শিক্ষিত হলে প্রতিভাধরের সৃষ্টি-সম্পদ নাকি তিন গুণ বেড়ে যাবে। অতঃপর প্রতিপক্ষেরা এর সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য শক্ত করে কোমর বেঁধে ডাঃ স্যুটসের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নামুন, সেই ফাঁকে প্রতিভার চিহ্ন ক'টি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু অবহিত হ'তে চেষ্টা করি।

আমার ধারণা ক্যামেরার পক্ষে অতি সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী লেন্সও যা, প্রতিভার স্ববেদিতাও তাই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, একটাতে বহির্জগতের ছাপ পড়ে যান্ত্রিকভাবে, অপরটিতে পড়ে মানসিকভাবে। অতঃপর ক্যামেরাম্যান যেমন ছাপটিকে মেজে ঘষে ছবি করে তোলেন, তেমনি প্রতিভাও তার দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ কল্পনার স্তরে প্রথমস্তরে-পাওয়া বহির্জগতের ছাপগুলিকে ছবির আকার দিতে থাকে। অগণিত, অবিন্যস্ত সেই ছাপগুলি যখন কল্পনার স্তরে ছবি হয়ে উঠছে, ঠিক তখনই স্বজ্ঞা তার শেষ টানে সেগুলির পরোৎকর্ষ ঘটিয়ে আমাদের সামনে তা বাস্তব বিগ্রহরূপে উপস্থাপিত করে। চিত্র-সংগীত-নৃত্য, সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটলে তাকে আমরা বলি স্বজ্ঞার কৃতি, আর দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওটা ঘটলে বলি আবিষ্কৃতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিভা-সৃষ্ট সম্পদ তিনটি স্তর পার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম স্তরে মালমসলা সংগ্রহ, দ্বিতীয় স্তরে তার সাজানো-গোছানো এবং তৃতীয় স্তরে তার অব্যবহিত পরোৎকর্ষ বা পূর্ণতা।

...এ উল্লেখ করা দরকার যে, অন্য সব সহজাত বৃত্তির মত প্রতিভা তার সার্থক স্ফুরণের জন্য যুগে যুগে সুযোগ ও পোষণ-প্রত্যাশী হয়ে থাকে। আমরা জানি, কি এদেশে কি ওদেশে সর্বত্রই প্রতিভার স্ফুরণে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেষ্টা আবহমান চলে আসছে এবং তাতে কত প্রতিভাই না অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এও তো সত্য যে, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাবে সে যুগে প্রতিভা স্ফুরণে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রয়াস যতটা হয়েছে, প্রতিভা সন্ধানে ততটা প্রয়াস দেখা যায় নি। ফলে সে ক্ষেত্রেও অনেক বনের ফুল বনেই শুকিয়ে গেছে। অতএব বর্তমান সমাজের দায় শুধু প্রতিভা স্ফুরণে সীমাবদ্ধ নয়,—তাকে প্রতিভাসন্ধানী দৃষ্টিও মেলে চলতে হবে। যুগপৎ এই দুটি কাজ করতে হলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই তার ভিত্তি-স্থাপনা করা উচিত। কারণ দৈহিক শৈশবের সঙ্গেই প্রতিভার শৈশবও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য সেই শৈশবকে লালন পালন করে দৃপ্ত যৌবনে উন্নীত করতে হ'লে চাই প্রতিভা-সন্ধানী শিক্ষক এবং প্রতিভা-স্ফুরণী শিক্ষাব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথকে। কারণ প্রতিভা-সন্ধানে বিশ্ব কবির দৃষ্টি যেমন দেশ-বিদেশে প্রসারিত হয়েছিল, তেমনি যাঁদের তিনি শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের জন্য এনেছিলেন, তাঁরা যাতে প্রতিভা-সন্ধানী হ'তে পারেন তার জন্যেও তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই শান্তিনিকেতনে থাকা কালে অধ্যাপকদের নিয়ে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, অনুশীলন-গবেষণা, রচনা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বলা-কওয়া এবং উৎসাহ দেওয়া তাঁর নিত্যকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার ক্লাসে পড়াতে গিয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের 'যার যেথা স্থান' তা খুঁজে বার করবার জন্য, জুতো সেলাই থেকে আরম্ভ করে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত প্রসারিত এক উদার পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন তিনি করছিলেন। বস্তুতঃ 'মোদের যেমন খেলা তেমনি রে কাজ'—এই সংগীতই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের মূল সংগীত। উদাহরণস্বরূপ, জাপানী জুজুৎসুবীর সানো সানের আখড়া, দীনেন্দ্রনাথ, চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ ভীমরাও, নকুলেশ্বর প্রভৃতি সংগীত-শিল্পীর আসর, 'শান্তি' 'প্রভাত' 'বাগান' 'বীথিকা' প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে লেখা পত্রিকার আবির্ভাব—ছাত্রদের সমাজসেবা, বাগান করা, মাটি কাটা, হাতের কাজ শেখা, সান্ধ্য উপাসনার পর বিনোদন পর্বে তাদের গাল-গল্প থেকে আরম্ভ করে লা মিজারেবলস্ প্রভৃতি বিশ্ব-সাহিত্য এবং দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক নানা কাহিনী শোনবার সুযোগ - তাদের

নিয়ে ঋতুতে ঋতুতে নিত্য নূতন ঋতু উৎসব এবং অভিনয়ের ব্যবস্থাদির ক
করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে ওজন, দূরত্ব, কোন জিনিস থেকে কি রকম
আওয়াজ বার হয়, সে সম্বন্ধে অতি শৈশব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের অনুমান-
পারদর্শী করবার জন্য কবিকৃত কত রকম প্রচেষ্টা যে চলত তার ইয়ত্তা নেই
আবার ক্লাশের ভিতরে ও বাইরে থেকে যাতে তারা আশ্রমের গাছ-
পালা, কীটপতঙ্গ, পাথর, বালি, এক কথায় প্রকৃতির সঙ্গে একটা মর্মঙ্গম নৈকট
স্থাপনে আগ্রহী ও সমর্থ হয়, তার জন্যও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কম ভাবেন নি
তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। এই থেকেই বোঝা যায় যে, শান্তিনিকেতন
আশ্রম-বিদ্যালয়কে তিনি একাধারে সৌন্দর্য ও বীর্যের পীঠস্থান করতে
চেয়েছিলেন। সেখানকার কর্মকাণ্ড ও পাঠসূচী যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়
স্পর্শ ক'রে, মস্তিষ্ককে নাড়া দিয়ে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সজীব ও সচল ক'রে
পরিণামে তাদের পূর্ণ আত্মপ্রকাশে সহায়তা করতে পারে, তার জন্য
ছাত্রমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মিমণ্ডলী নিয়ে যৌথ দায়িত্বের প্রবর্তন
করেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়েছিল যে
বাহির যেমন ভিতরকে গড়তে থাকে তেমনি ভিতরও বাহিরকে আকার দেয়
বস্তুতঃ কবি-রূপায়িত শান্তিনিকেতনের হৃৎপিণ্ড যুগপৎ কড়ি-কোমলে, সৌন্দর্য-
বীর্যে, আমিত্ব-সবত্বে দ্বৈপায়নত্ব-সার্বজাতিকতায় নিয়ত স্পন্দিত। দুর্ভাগ্যের
কথা এই যে, তাঁর সেইসব চিন্তা ও তার রূপায়ণ সামগ্রিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি
এবং যাঁরা এসবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আজ চলে গেছেন
এবং একে একে বিদায় নিচ্ছেন। ফলে এসব কাহিনী সত্য-মিথ্যা মেশানো কিং-
বদন্তীর রূপ নিচ্ছে এবং হয়তো বা খানিকটা নিয়েছেও। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ
এদিকে দৃষ্টি দিলে শিক্ষা-প্রণালীর দিক থেকে, তৎকালিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের
জীবনচর্যার দিক থেকে একাজটি একাধারে বৃহৎ ও মহৎ হবে বলে আমার
বিশ্বাস। পরিশেষে আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। অনেকের ধারণা
শান্তিনিকেতন মানে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও চিত্রকলার সমাবেশ। কিন্তু
এই সমস্ত চারুশিল্পের সঙ্গে কারুশিল্পের যোগাযোগ তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্ব
থেকেই রেখেছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি: 'দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের
শিক্ষার, দেহের সফলতার সঙ্গে মনের সফলতার যোগ আছে—এই আমার
দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকমের মিল করতে না পারলে আমাদের
জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।' এই ছন্দ যাতে অব্যাহত থাকে, যাতে ছাত্র-

ছাত্রীদের প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ ঘটে, তার জন্য যেমন মুক্তাকাশের তলে খোলা মাঠে এক উদার শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন তিনি করেছিলেন, তেমনি তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সন্ধানেও তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নতুবা ঠাকুর এস্টেটের সেরেস্তার জমা খরচের খাতা থেকে "বঙ্গীয় শব্দকোষ" প্রণেতা বার হয়ে আসেন কি করে—কি করে মুক্তি পান জমিদারি-দপ্তরে-বন্দী-রাখা বিজ্ঞান বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক জগদানন্দ রায়—কি করে সংগৃহীত হন অক্লান্ত গ্রাম সেবক কালীমোহন ঘোষ এবং আরও অনেক নিবেদিত-প্রাণ। কবির এই প্রতিভা-সন্ধানী দৃষ্টি বাংলা থেকে ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ থেকে সমগ্র প্রাচ্যের সীমা ছাড়িয়ে প্রতীচ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। নতুবা "প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার" এনে এনড্রুজ কবির নমস্য হন কি করে? কি করেই বা এনড্রুজ "দীনবন্ধু" হয়ে ওঠেন? এমনি কত শুচিশুদ্ধ নামের নামাবলি শ্রদ্ধার সঙ্গে গায়ে জড়িয়েই না শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী হয়েছে। আসলে কি ছাত্র—কি শিক্ষক—কি কর্মী—যাঁর মধ্যেই একটু না একটু সম্ভাবনা দেখতেন, তাঁকেই দিতেন তিনি স্বাধীনতা, অনুকূল পরিবেশ এবং কর্মকাণ্ডের বিচিত্র সুযোগ। এর ফলে শুধু যে অজিতকুমার, প্রভাতকুমার, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণ, নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথের মত রথী-মহারথীদের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছিল তা নয়, অনেক পদাতিকও শান্তিনিকেতনে নিজ নিজ সাধ্যমত পদ চিহ্ন রেখে গেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সব চেয়ে বড় বিস্ময় চিহ্নিত হয়ে আছে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথের রূপে। বড় বিস্ময় এই কারণে যে, একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এতবড় কবি প্রতিভার এতখানি ভাবনা চিন্তা বহন করা—এতখানি সময় ও সামর্থ্য—বিত্ত ও চিত্ত ঢেলে দেওয়ার নজির পৃথিবীর ইতিহাসেও বোধ করি আর দ্বিতীয়টি মেলে না। তিনি নিজেই বলে গেছেন,—'শান্তিনিকেতন আমার কাছে বাস্তব কাব্য, আমার জীবনের সেরা পণ্য-বাহী তরণী।' অন্য কিছুর জন্য না হোক অন্ততঃ প্রতিভার সন্ধান এবং তার সার্থক স্ফুরণের দিক থেকে প্রতিভা-সন্ধানী শিক্ষাতত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের দিক থেকেও কবির এই মন্তব্য যাচাই করা দরকার। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষকের উচিত এই "বাস্তব কাব্য" শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা যে, সে "কাব্য" আদৌ ধর্তব্য, না, শুধুই শ্রাব্য—সে "পণ্যবাহী তরণী" আমাদের পক্ষে প্রশস্ত সরণী না, শুধুই "মায়া-বন-বিহারিণী হরিণী"!

"মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে"

হ্যাঁ, কথা খুঁজে খুঁজেই মানুষ ফিরছে। এই তার সাধনা—এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে সাধনার ইতিহাস কি কেবল তার ঘটমান বর্তমানেই সীমাবদ্ধ, না, তার সীমারেখা পুরাঘটিত অতীত থেকে পুরাঘটিত বর্তমান এবং তা থেকে নিত্যবৃত্ত বর্তমানের ওপারে ভাষার অতীত তীরে যে অনাগত ভবিষ্যত, তার পানে পাখা মেলেছে? তা যদি হয়, তাহলে 'মানুষ মরিছে কথা খুঁজে খুঁজে'—একথা বলাও যায়। এতে পাঠান্তরের অপরাধ ঘটলেও বোধ করি অর্থান্তর ঘটে না—অন্ততঃ ঐতিহাসিক অর্থে তো নয়ই। কারণ যুগযুগান্ত পাড়ি দিয়েও মানুষের কথা খোঁজার অন্ত হল না—বিষণ্ণ মৌনতা এখনও তার কাছে প্রসন্ন মুখরতায় ভরে উঠল না। পারল না সে মৌন কাঠিন্যকে অমৃত-নিস্যন্দী মুক্তধারায় সরস করতে—কোলাহলের বন্যা পার হয়ে কথার পলিমাটিতে পদক্ষেপ করতে—সংঘাত-ক্ষুব্ধ অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপ থেকে সংগীতমুখর সার্থক সংজ্ঞাযুক্ত আলাপে পৌছাতে। কিন্তু এই পরাজয়কে সে মেনে নেয় নি—তাই আজও "মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে" মানুষ মরিছে কথা খুজে খুঁজে। এইখানেই তার এক আশ্চর্য গৌরব। কারণ সে বুঝতে শিখেছে যে, সার্থক কথা শেখা ও বলার মধ্যে দিয়েই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন ঘটবে। এইখানেই আছে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির অক্ষয় রক্ষাকবচ—তার ইষ্ট সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

কিন্তু প্রশ্ন হল—সে কোন কথা—কি তার স্বরূপ—কে তার কথক—শ্রাবক কে—শিক্ষকই বা কে তার—কোথায় পাব তার শিক্ষার্থীরে! এমনি সব কত প্রশ্ন আজ উত্তরের আশায় উন্মুখ। মানব কল্যাণ-কামী প্রত্যেকটি মানুষকেই আজ ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নতুবা অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে মানবতা বলতে যা বোঝায়—মানব সভ্যতা বলতে যা বুঝি, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্য সে পৃথিবীতে এখনকার মতই মানুষ আসবে এবং যাবে কিন্তু সে হবে অমানুষ-অধ্যুষিত এক বর্বর বনভূমি। বলা বাহুল্য, ইতিহাসই তর্জনী তুলে বারবার সে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে। তবু মানুষ ইতিহাস-আহৃত সে শিক্ষাকে গ্রহণ করেনি। এর জন্য দুঃখও সে

কম পায়নি। তবু সে ভূমাকে ছেড়ে অল্পকে গ্রহণ করে আশুতোষ হতে চেয়েছে, ভুলে গেছে যে, শাসনসংযত শিব-সাধনার মধ্যে দিয়ে আশুতোষ না হতে পারলে-আশুতোষ ঈশানরূপে প্রলয়-বিষাণে স্থর তোলেন। কিন্তু ও-সব কথা আপাততঃ মুলতুবী রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম প্রশ্ন হল, কথার স্বরূপ কি? এর উত্তরে সহজেই বলা চলে যে, সার্থক কথার মধ্যে যুগপৎ বলা ও শোনা এই দুটো কাজ চলতে থাকে। আর তার প্রধান উদ্দেশ্য হল বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংযোগ-সাধন—এক মর্মস্পর্শী নৈকট্য গড়ে তোলা। ধরা যাক, বাজারে গিয়ে ক্রেতা হিসাবে এক বিক্রেতাকে বললাম, এক পয়সার লঙ্কা আর দু' পয়সার সরষের তেল দিন তো। অবশ্য বর্তমান বাজারে আমার মত এ রকম বক্তা ক্রেতার কোনো বিক্রেতা-শ্রোতা জুটবে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। বরং বলা চলে যে, বিক্রেতা আমার মস্তিষ্কের স্থস্থতা সম্বন্ধেই উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠবেন। স্থতরাং এক্ষেত্রে কথা-স্থত্রের আদিতেই ইতি, দুজনের মধ্যে সংযোগ-সাধন তো দূরের কথা। কিন্তু এমন ব্যক্তিও তো থাকতে পারেন, যিনি সত্য সত্যই সাত মণ তেল পোড়াতে পারেন এবং রাধাকেও নাচাতে পারেন। এখন তিনি যদি ক্রেতা হিসাবে বাজারে উপস্থিত হন তাহলেও কি বিক্রেতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় নৈকট্য ঘটবে? মনে হয়, না। অবশ্য এটা ঠিক যে, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা, ক্রেতার কথায় উৎকর্ণ হবেন—সাগ্রহে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবেন এবং পরিশেষে যথোচিত মূল্য নিয়ে তাকে বিদায় দেবেন, এমনকি হাতে সময় থাকলে এবং বিশেষ করে ব্যবসাবুদ্ধি সচেতন হলে ক্রেতার প্রতি এক টুকরো হাসি বা একটি ছোট্ট নমস্কারও তিনি ছুড়ে দেবেন। কিন্তু বক্তা-ক্রেতা ও বিক্রেতা-শ্রোতা দুই বিপরীত মেরুতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক্ষেত্রে সংযোগ-সাধন যদি হয়েই থাকে, তাহলে তা হয়েছে বস্তুর সঙ্গে অর্থের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নয়—মনের সঙ্গে মনের কথা তো একেবারেই অবান্তর। বড় জোর এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, এদের মধ্যে সম্পর্কটা বাণিজ্যিক হলেও একেবারে অমানবিক বা অমানুষিক নয়—আস্থরিক তো নয়ই। বুঝতে পারছি, এবার পাঠক অধৈর্য হয়ে বলে উঠবেন-কথার স্বরূপ যদি জানতেই হয়, তাহলে স্থন-তেলের বাজারে যাওয়া কেন, মশায়? তার চেয়ে চলে আস্থন রাজ-দরবারে—রাজনৈতিক আলোচনার আসরে—যেখানে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের ধুরন্ধরেরা দরবারী চালে 'নিগোশিয়েশন' চালাচ্ছেন। কথার স্বরূপ তো

সেখানেই স্বরূপে বর্তমান। এক একবার মনে হচ্ছে—'সে কথা বড় খাঁটি।' তবু, পোড়ামুখে প্রশ্ন ওঠে—'এত কি হবে সিধে?' কারণ ধুরন্ধরেরা কথা ব'লে ধুন্ধুমার বাধান তথাকথিত রাজনৈতিক আপোষের জন্য—আলাপের জন্য নয়—অথচ আমাদের 'কথার' স্বরূপে আলাপের সুরটাই যে আদিস্বর। অন্যদিকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ কিসে ভালভাবে রক্ষিত হয়, কিসে কূটনীতিবিদ্ হিসাবে অন্যপক্ষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাক্যজালে বাঁধা যায় - রাজনৈতিক আপোষ-আলোচনায় সেটাই যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সার্থক সংযোগের অবসর কোথা? ফলে আপোষ শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া পা-পোষের মর্যাদাও পায় না। আর তার পরিণাম? পরিণাম পারমানবিক বোমা—হিরোশিমার স্থির মৃত্যু—যদিও তা আদৌ হিমশীতল কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এর চেয়ে বরং মল্লভূমিতে পণ্ডিতী আসর ভাল। কারণ সেখানে দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই পক্ষের বকাবকি ঝকাঝকি এমন কি মারামারি পর্যন্ত চললেও অন্ততঃ মহামারী দেখা দেয় না। তবে সেখানেও কথা হয় না বা কথার স্বরূপ ফোটে না। কারণ প্রত্যেক পক্ষই আপন আপন দম্ভের স্তম্ভে বসে প্রতিপক্ষের দিকে সেখানে দম্ভোলি নিক্ষেপে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় কথার মধ্যে যুক্তি থাকলেও সে যুক্তিতে মনঃসংযোগ করবার মত মুক্ত মন কোনো পক্ষেরই থাকে না এক পক্ষের সার্থক উদ্ধৃতি-উদাহরণ অন্য পক্ষের উদাসীন শ্রবণে ব্যর্থতায় সঙ্কুচিত হয়—তত্ত্ব ও তথ্যের আহরণ উদার পরিবেশের অভাবে সংহত হতে পারে না—পারে না উভয় পক্ষের মধ্যে মিলন-সংহিতা রচনা করতে। তখন বক্তা এবং শ্রোতার সংযোগ সেখানে সংকীর্ণ শতধাদীর্ণ সংশয় সঙ্কুল। ফলে এ আসরেও কথা পেলাম না—পেলাম কথা কাটাকাটি বা মাথা ফাটাফাটি—আক্ষরিক অর্থে তো বটেই ব্যঙ্গার্থেও বোধ করি তার ব্যত্যয় ঘটে না। আসলে কথা যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মগজ থেকে কাগজে চালান হয়—মাথা থেকে মনে পৌঁছায় না, সেখানে দু-পক্ষের মধ্যে সংযোগ-মধু যোগাবে কোন জাদু, অথচ আমাদের 'কথার' জানই হল এই সংযোগ-মধু।

হয়তো এই কারণেই কোনো কোনো মানুষ মনস্বী হয়েও মুখ খুলতে চান না—না সভাসমিতিতে না সাংসারিক জীবনে। এঁরা কস্তুরী মৃগের মত আপন গন্ধে পাগল হয়ে আপন মনের বন-উপবনে ঘুরে বেড়ান এবং সেখানে বসেই মুখ খুলে মন খোলসা করেন। কারণ যথার্থ মনস্বিতা যেমন অযথা মুখর

নয়, তেমনি মৌনতা বিরোধীও বটে। কিন্তু তাঁর শ্রোতা কে? বলা বাহুল্য সে শ্রোতা তাঁরই মানস-সৃষ্ট তাঁর এক দ্বিতীয় কাল্পনিক সত্তা। এর সঙ্গেই মুখোমুখি হয়ে বসে নিভৃতে তিনি বিশ্রম্ভালাপ করেন—প্রশ্নোত্তর করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌছান। সে সিদ্ধান্ত দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সব কিছুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে পারে। এক কথায় মানব-সত্য বলতে যা বোঝায় এই গোপনচারী বিশ্রব্ধরীতি তাকেই উদ্‌ঘাটন করে—তাকে ভাষা দেয়—তাকে কথা দিয়ে আলাপের আঙ্গিনায় আসন পেতে দেয়। ইংরেজীতে এই জাতীয় বস্তুকেই বোধ করি 'মনোলোগ্‌' বলা হয়। এক্ষেত্রে কথক ও শ্রাবক—একজনই। ফলে মোহমুক্ত মন নিয়ে তিক্ততাহীন মানসিক পদচারণা করবার এবং প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে ভেবে দেখবার অবকাশ এখানে মেলে। রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। ভূতের সংখ্যা সেখানে পাঁচটি হলেও মন একটাই। ফলে আর যাই হোক, ভূতুড়ে কাণ্ড অন্ততঃ ঘটে নি।

বাংলা প্রবাদে আছে—একা না বোকা। অর্থাৎ সকল ব্যাপারে একলা না চলে দোকলা চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে জার্মান পণ্ডিত নীটশের একটি উক্তির। তাঁর মতে একজন একক হয়ে কাজ করলে সব সময়ে ভুল করে। সত্য শুরু হয় দুজনকে নিয়ে। মনে হয়, তাঁর উক্তির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। কারণ সত্য আবিষ্কারের জন্য—তার প্রচারের জন্য—একক মানুষ কখনই যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন দোসরের—সহযোগিতার—আর যেখানেই সহযোগিতা আছে—সেখানেই থাকে সহযোগী—সংযোগ সংস্থা এবং সমাজ। জন ডিউই তাঁর সুবিখ্যাত 'ডেমোক্র্যাসী এ্যাণ্ড এডুকেশন' গ্রন্থের একস্থানে মন্তব্য করেছেন, কমন্‌, কমিউনিটি কমিউনিকেশন্‌ প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে আক্ষরিক সম্বন্ধ ছাড়াও একটা গভীর সম্বন্ধ দ্যোতিত হয়েছে। বস্তুতঃ সমস্ত সংস্থা এবং সংযোগের মূলমন্ত্র হল সম-অধিকার ও সদৃশ-মানসতা। এই মন্ত্রেই একটা সংঘাতহীন সমাজ গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য সংঘাতহীন সমাজ বলতে যে—সেটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাত শূন্য, তা নয়। আসলে লক্ষ্য ও বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন ও প্রত্যাশার প্রতি সম-অধিকার ও সদৃশ-মানসতা থাকলে যে সমাজ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও সার্থক কথাসূত্রের সংযোগ হারায় না—জঙ্গমতা হারায় না বরং তার দ্বারাই সেটি

সচল থাকে আমরা তাকেই সংঘাতহীন সমাজ বলে ধরেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের প্রাণকেন্দ্র হল সংযোগ এবং সে সংযোগ যে কোনো দিক দিয়েই সাধিত হোক না কেন তাকে কথার সূত্রে বাঁধতেই হবে। নতুবা সংযোগ সম্প্রসারিত হয় না—এবং সমাজও স্থবির হয়ে ওঠে। এখানে আরও বলার দরকার যে, এই কথা-সূত্রের স্বরূপ ভাষার ভিতরে থাকলেও যদি তার মধ্যে সমভাব না থাকে তাহলে সেটি ত্রিশঙ্কুর দশা পায়। কারণ সমভাবহীন ভাষা বক্তা এবং শ্রোতাকে বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে দেয়, জটিল আবর্তে ডুবিয়ে দেয়, সমভাবের মধ্যে—সম-অধিকারের মধ্যে তাদের স্থিতিলাভ করতে দেয় না। ফলে সে ভাষার কথা আদৌ আমাদের 'কথা' নয়। আমাদের 'কথা'র প্রাণকেন্দ্র হল ভাব—একেবারে সমভাব—ভ্রূ কুঁচকে নয়—নাক উচিয়ে নয়—তির্যক দৃষ্টিতে নয়—একেবারে মুখোমুখী হয়ে মন খুলে দুজনের মধ্যে যে আলাপ চলে তাই হল "কথা", আমাদের ভাষায় সার্থক "কথা"। আমাদের মতে তাই হল মিলন তাই হল সার্থক সংযোগ সাধন। এতে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি এককথায় যে কোন নীতি নিয়েই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে আলোচনা চলতে পারে। কারণ সে আলোচনায় আলো আছে—তাপ নেই, দীপ্তি আছে—দাহন নেই, অগ্রগতি আছে—উগ্রতা নেই—নেই ঔদ্ধত্যের অহংসর্বস্বতা। একথার শেষ পরিণতি ফলপ্রসূতা—বন্ধ্যাতা নয়। এই কথার জন্যই মানুষ মাথা খুঁড়ছে। এবারে হয়তো পাঠক বলে বসবেন, বুঝেছি—মশায় বুঝেছি। আপনি যে কথামৃত এতক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে শোনালেন—সে তো কেবল বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুরই হয়ে থাকে। তা বন্ধুর সঙ্গে মধুর কথা বান্ধব মহলের জন্যই তুলে রাখুন, ওকে সম্বল করে নিজেও সংসারে নামবেন না বা কাউকে নামতেও পরামর্শ দেবেন না। কিন্তু ঠোঁটকাটা না হয়েও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে—বন্ধুত্ব হওয়ার পর সার্থক কথাসূত্র গড়ে ওঠে, না সার্থক কথার সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে? অধমের ধারণা ব্যক্তিব সঙ্গে ব্যক্তির—দেশের সঙ্গে দেশের—রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠবার আগে কথাসূত্রই আদিতে নান্দীপাঠ করে। কিন্তু তার বিপরীতটা এই পোড়াচোখে দৃষ্ট হয় নি বা এই ক্ষুদ্র কর্ণে শ্রুত হয় নি। এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে একবার মনে করে দেখুন তো বিশ্বরাজনীতির সেই উদ্বেগভরা বিগত দিনগুলির কথা! সেই সঙ্গে মনে করতে চেষ্টা করুন সেই দিনটির কথা, যেদিন ক্রুশ্চেভ ও কেনেডির মধ্যে টেলিফোনে

সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল। বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, সেই শুভদিনে আমার মত আপনারও কি মনে হয় নি যে, ঘন তমিস্রা ভেদ করে এক উজ্জ্বল আলোককণা পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। কিন্তু কেন? না, সেদিন এই দুই রাষ্ট্রনায়ক পরস্পরের সঙ্গে সার্থক ও ফলপ্রসূ করার সূত্র ধরে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন—চেয়েছিলেন বিশ্বজোড়া বন্ধুর পথকে মধুর করতে—বিক্ষুব্ধ বিশ্বকে শান্ত করতে। এর পরও কি বলতে পারব না যে, সার্থক কথা—অর্থাৎ সমভাবে ভাবিত হয়ে পারস্পরিক আলাপই হল মানব সত্তার অন্তর্নিহিত মহতী সম্ভাবনার দ্যোতক ও উদ্বোধক—তথা বিশ্বমানবতার ধারক ও বাহক? বস্তুতঃ সার্থক কথাই মানবসভ্যতার আদ্যাপীঠ।

অবশ্য রাশিয়া এবং আমেরিকাই বিশ্বদরবারের সব নয়—সে দরবারে রথী মহারথী থেকে দীনাতিদীন পদাতিক পর্যন্ত সকলেই সমান আসন পাবার যোগ্য। সুতরাং এই আসনে বসে কথা বলা এবং কথা শোনাই হবে মানুষের মহতী কীর্তি—তার শ্রেষ্ঠ ইষ্টি। কিন্তু সেখানে কে শোনাবে সেই কথা, শুনবেই বা কে? এর উত্তর ইতিহাসই দিয়েছে। ইতিহাস বলে, দরবারী কানাড়া যখন সার্থক শিল্পীর কণ্ঠে মন্দ্র মধ্য ও তার সপ্তকের আরোহ অবরোহকে আশ্রয় করে আন্দোলিত হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখন সহস্র শ্রোতার দ্বি-সহস্র কর্ণ এক কর্ণ হয়ে ওঠে - তখন সেটি আর "একাকী গায়কের নহে তো গান।" তটের বুকে জলের ঢেউ লাগবে অথচ কলতান উঠবে না - একি হতে পারে? হতে পারে না বলেই সে দরবারে কোন সুদূর অতীতে উচ্চারিত "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" - বাণী আজও অমৃত হয়ে রইল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সেখানে আমরা শুধু শ্রোতা হয়েই বসে থাকি নি—আমরাও শুনিয়েছি আমাদের কথা—হয় তো যেমন করে বললে অপরে শোনে তেমন করে বলতে পারি নি। তবু আমাদের না বলতে পারা কথা নিয়ে কথাসিদ্ধেরা বাণী-বিগ্রহ রচনা করেছিলেন বলেই—আমরা তাঁদের কথা কান পেতে শুনেছি। সুতরাং যদি প্রশ্ন ওঠে, ঐ বিশ্ব-দরবারী সংগীতের কথক কে বা শ্রাবক কে—তাহলে নিঃসংশয় নিশ্চয়তায় উত্তর দেব—তুমি—আমি—সকলে। সে রাজত্বে আমরা সবাই রাজা। কারণ বক্তা ও শ্রোতা এখানে সহকর্মী বন্ধু—এখানে কথকও শ্রাবক, শ্রাবকও কথক। সহৃদয় হৃদয় সংবাদিতার গুণে উভয়পক্ষই এখানে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ তারা দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত, আবার অদ্বৈত হয়ে দ্বৈত। এবার হয়তো প্রশ্ন উঠবে—"সে কি সহজ গান?" নয়ই

তো—কিন্তু তার জন্যই তো মানুষের সাধনা—সেই জন্যই তো "মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে"। সে সহজের জন্য জাত নয়—কঠিনের জন্যই তার জন্ম—তার সাধনা—তার মৃত্যুর মহোৎসব।

"—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"
"—তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য উপহারে—
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

—কিন্তু সে কোন আশায়? না—সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে কলহদীর্ণ-মানবসভ্যতা সমস্বরে আনন্দগান গেয়ে উঠবে—মানুষ মহাজীবনের সন্ধান পাবে—এই মহতী আশায়।

আমাদের শেষ প্রশ্ন ছিল—কে হবেন এর শিক্ষক—কে শেখাবেন এই সার্থক কথাসংগীত। এর উত্তরও ইতিহাস দিয়েছে। অন্য দেশের কথা জানি না। কিন্তু ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আবার আধুনিক যুগে রামমোহন রায় থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-শ্রীঅরবিন্দ প্রদর্শিত পথে সে প্রশ্নের উত্তর মিলবে। এঁরাই কথকরূপে বার বার বলে গেছেন যে, সার্থক কথাসংগীত রচনার দায় একার নয়—এটি যৌথ কারবার। ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে সকল মানুষের জন্যই আজ সে সংগীত রচনা করতে হবে এবং তাকে প্রচার করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, মানুষ ইতিহাস-আহৃত শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে বারে বারে ভুলে যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই ভুল শোধরাবার জন্য বিশেষ করে শিক্ষক সম্প্রদায়কেই আজ নিজ নিজ সাধ্যমত এগিয়ে আসতে হবে। এটি শুধু উত্তরের জন্যই উত্তর নয়—প্রকৃতপক্ষে শেষ প্রশ্নের এটিই বোধ হয় শেষ উত্তর। কারণ সমগ্র ভাবী সমাজের মুখ খোলাবার— মন মেলাবার এবং পরিণামে সেই মিলনের ভিত্তিতে বিশ্বমেলা বসাবার দায় তাঁদের উপর যেমন করে বর্তেছে তেমন আর কারও উপর নয়। জানি—এ দুর্লভ দ্রব্য ইস্কুল-কলেজের টাইম-টেবলে ছক কেটে গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু এও তো

অবধারিত সত্য যে, শূন্যের উপরও কোনো সার্থক সৌধ স্থাপিত হয় না। সুতরাং সার্থক কথা শেখাতে হলে প্রত্যেক বিদ্যাপীঠে একটা সবাস্তব ও সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।

সেদিক থেকে শিক্ষকের বাহ্যিক সম্বল হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়। একটি সজীব অন্যটি নির্জীব। তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ হল, মধ্যস্থ হয়ে কথার মাধ্যমে এই সজীব ও নির্জীবের মধ্যে সার্থক সংযোগ ঘটানো। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একাত্ম সাধন করা। সেটি করতে গিয়ে শিক্ষককে কথা বলতে হয়, কথা বলাতে হয়, নিজেকে কাজ করতে হয়, কাজ করিয়ে নিতে হয়—এমনি কত কি। আমার ধারণা এইসব দিনানুদৈনিক খুঁটিনাটি কাজ পরিপাটি করে সম্পন্ন করতে হলে শিক্ষককে যেমন সার্থক ও ফলপ্রসূ কথা বলতে হয়—তেমনি শিক্ষার্থীকেও সার্থক কথা বলতে শিখতে হয়। এমনি করে একটা আবহমান হয়ে-ওঠা বস্তু পরিণতিতে সৃষ্টিতে উন্নীত হয়। কিন্তু শিক্ষক যে সার্থক ও ফলপ্রসূ কথা বলছেন—শেখাচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীও যে তা শিখছে এবং করছে—তার মূল্যায়ন করব কিভাবে? বলা বাহুল্য সে মূল্যায়নও সঠিকভাবে তথাকথিত পরীক্ষা দিয়ে বা তার মানজ্ঞাপক সংখ্যা দিয়ে করা যায় না। তবু বলব পরীক্ষা নিরিন্দ্রিয় নয়—সে নিরীক্ষক ও প্রদর্শক দুই-ই।

এ প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করছি। যতদূর মনে পড়ে, ছাত্রজীবনের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সাহিত্যে যদি পেতাম একাশি, তাহলে গণিতের বেলায় সাহিত্যে ঐ সংখ্যাটার একক দশক নির্ঘাৎ স্থান বদল করে নিত। অবশেষে নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই ম্যাট্রিকুলেশন বৈতরণী পার হয়ে গেলাম। পরিণত বয়সে ভেবে দেখেছি যে, প্রধানতঃ সাহিত্য শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও গণিত শিক্ষকের প্রতি বিরাগই ছিল এর মূলে। আসলে ব্যক্তিগত ভালবাসা বা বিরাগই যথাক্রমে বিষয়গত প্রীতি ও অনীহাতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সেটিই গণিত ও সাহিত্যের পরীক্ষাতে প্রতিফলিত হত। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজ তাঁরা উভয়েই গত এবং শিক্ষক হিসাবে উভয়কেই আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, একজন আমার কাছে আজও সাহিত্যের মতই সজীব এবং অন্যজন গণিতের মতই মৃতপ্রাণ। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, একজন সাহিত্য ও আমার মধ্যে সার্থক ও ফলপ্রসূ কথা বলে—কথা শিখিয়ে সাহিত্য ঘটিয়েছিলেন—ফল তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিষয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সাহিত্যের সঙ্গে একাত্মতা। আর

বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা মানেই তো বিশ্বমানবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—বিশ্বমানবের সঙ্গে কথা কওয়া। ওতে যে শিক্ষার্থীরই জন্মান্তর ঘটে—তার মানসিক ও আত্মিক উদ্গতি শুরু হয়। আমার বিশ্বাস এমনি করে সীমিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসেও ছাত্র সমাজ আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পারে—আপন বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া পেতে পারে এবং বিশ্বলোককে সাড়া দিতে পারে। এখানে বসেই সে উপলব্ধি করে যে, সার্থক ও ফলপ্রসূ কথা যথার্থই মানব-সভ্যতার মধ্যমণি। সেই সঙ্গে শিক্ষকেরও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, ছাত্র সমাজের সেই উদ্গতি ঘটাতে গেলে প্রথমেই চাই শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আত্মিক ঐক্য। শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্যই থাকবে এবং তার সঙ্গে শিক্ষার্থীরও সার্থক সংযোগ ঘটানো চাই। কিন্তু সে হল ও-রাগের অনুবাদী স্বর—বড় জোর সংবাদী—বাদী আদৌ নয়। সুতরাং যে শিক্ষক কথা বলবেন—কথা বলতে শেখাবেন, তাঁকেই নেমে আসতে হবে কর্তৃত্বের স্তর থেকে শিক্ষার্থীর অন্তরে—একেবারে বন্ধুত্বের পর্যায়ে। সে স্তরে পারস্পরিক কথাবার্তা হবে—এমনকি মত মতান্তরও ঘটবে, কিন্তু মনান্তরের মৌন মন্বন্তর কখনই ঘটবে না এবং শেষ পর্যন্ত রাগ বিস্তারে যেমন বাদী স্বর অবিনাভাবে যুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি উভয়ের কথার মধ্যেও সমভাব সংগত করে চলবে। কারণ এ তো শুধু মুখ খোলবার ব্যাপার নয়—এ যে মন খুলে মন খোলসা করা—মনের সঙ্গে মনের কথা কওয়া। তাই তার শেষ ফল প্রশান্তি।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী - সমবায়ে গড়ে-ওঠা প্রশান্তি মন্ত্রে দীক্ষিত এই যে সমাজ, বিশ্বসমাজে তার দান সুদূর প্রসারী। কারণ এই সমাজই 'হিংস্র প্রলাপের মধ্যে' শান্ত আলাপে বিশ্ব-বিবেককে জাগ্রত করতে পারে—পারমাণবিক প্রলয়ঙ্করী শক্তিকে শুভঙ্করীতে পরিণত করতে পারে, পারে 'মানহারা মানবীর দ্বারে' দাঁড়িয়ে ক্ষমার মন্ত্র উচ্চারণ করতে। কিন্তু পারে বলছি কেন? এছাড়া কি বাঁচবার অন্য কোনো পথ আছে? আমার দৃষ্টি বেশী দূরে চলে না। তবু যতদূর দেখতে পাই তাতে বুঝতে পারি যে, সার্থক কথা-দিয়ে-গড়া পথই প্রশস্ত ও প্রাণদ। সে পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলে শুধু আমার কথাটিই ফুরাবে না—নটে গাছটিও মুড়াবে। এরপরও কি বলব না যে, কথা বলার সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা—মানব সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং তার ব্যত্যয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা—তার প্রাণাত্যয়?

বাংলা সনেটে নূতন সুর

বাংলা সাহিত্যে "সনেট"-এর ইতিহাস খুব বিস্তৃত নয় হয়তো বা খুব বেশী সমৃদ্ধও নয়, কিন্তু একথা স্বীকার্য যে কবি শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরীর "সনেট পঞ্চাশৎ" এই সংক্ষিপ্ত সনেট-ইতিহাসে একটা বিশেষ অধ্যায় রচনা করিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্ত হাস্যরসিক বীরবলকে আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু তিনিই যে আবার সনেট রচনায় "কালাপাহাড়ী" আঙ্গিকের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহা হয়তো অনেকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের সনেটের ইতিহাসে এই কাব্যগ্রন্থখানি ব্যতিক্রম হিসাবেই প্রথমতঃ উল্লেখ; অথচ ১৪টি সংক্ষিপ্ত পংক্তিতে ব্যক্তি-মনোভাব প্রকাশ করিবার যে চিরাচরিত পদ্ধতি সনেটে চলিয়া আসিতেছে, আপাতঃদৃষ্টিতে কোথাও তাহার বৈপরীত্য ঘটে নাই। সুতরাং তৎরচিত যে কোন সনেটের বহিরঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় যে, এখানেও 'কালাপাহাড়ী' রীতি বর্ত্তমান। শ্রদ্ধেয় শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে রচিত চর্য্যাপদে সনেটের কাঠামো আবিষ্কারের-দাবি করিলেও প্রকৃতপক্ষে সনেট বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক সম্পদের মতই একটা বহিরাগত সম্পদ, এবং মধু-কবির প্রতিভা প্রবাহের ফলেই ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ইউরোপীয় সনেটের দুইটি রীতি—পেত্রাকীয় ও সেক্ষপীয়রীয়। প্রথম রীতি অনুসারে ইহার প্রথমাংশ ৮ পংক্তি ও দ্বিতীয়াংশ ৬ পংক্তিতে সমাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয় নিয়মে ইহা যথাক্রমে ৪+৪+৪+২ এই চৌদ্দটী পংক্তিতে সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য এই শেষ দুই পংক্তিতেই ভাবের চরম পরিণতি ঘটে। প্রমথ চৌধুরী সেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করিলেও সেটা করিয়াছেন "কালাপাহাড়ী" রীতিতে অর্থাৎ উল্টো পদ্ধতিতে। সাদা কথায় ৪+৪+৪+২ বিভাগের স্থলে, তিনি বিভাগ করিয়াছেন ৪+৪+২+৪ অথচ সর্ব্বসমেত ১৪টি পংক্তির ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

চিরাচরিত প্রথার এই যে ব্যতিক্রম, আমাদের ধারণা, ইহার মধ্যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে। ইহার শেষ কথা ক্লাইমাক্স বা পরাকাষ্ঠা নয়—শেষ কথা এ্যাণ্টিক্লাইমাক্স—দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ধপাস্ করিয়া শুইয়া পড়ার মত।

কবি প্রথম হইতে পাঠককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ৯ম ও ১০ম পংক্তিতে ভাবের চরম শিখরে পৌছাইয়া দিলেন, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী পংক্তিতেই বুঝিতে পারিলাম ভাবের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, ক্রমারোহণের পালা শেষ—এইবার অবরোহণের পালা। আবার তাহাও আকস্মিক—সুতরাং ভাবের জগৎ হইতে "পপাত ধরণীতলে" ছাড়া আর উপায় কি? ভাবলোকে এই যে ক্রমারোহণের পর একটা আকস্মিক অবরোহণ, ইহা প্রত্যাশিত ফলের বিপরীত, ইহাতে পাঠকের মনোভাব ঘনীভূত না হইয়া তৎ পরিবর্তে, একটা মৃদু কৌতুকরস জাগিয়া ওঠে। বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটের গঠন-বৈশিষ্ট্য ইহাই এবং এই কারণেই কবির ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবের সঙ্গে এই রীতি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

আঙ্গিকের দিক হইতে তিনি যেমন সনেটের আকৃতিকে স্বীকার করেন নাই, তেমনই, ভাবের দিক হইতেও তিনি ইহার প্রকৃতিকে চিরাচরিত মর্যাদা দেন নাই। 'সনেট'-এর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে গীতি-কবিতার অঙ্গ হিসাবে। পেত্রার্কীয় সনেটে প্রেম-নিবেদনের একটা প্রকারভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রেম-প্রকাশের বৈকল্পিক বাহন—লিরিক ও সনেট, তবে লিরিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত, আর সনেট, ঘনীভূত, শাসন-সংযত ও নিয়ন্ত্রিত বাহন। প্রেমিক মনের বদ্ধমূল দার্শনিক মনোবৃত্তি এবং রীতিবদ্ধ ও বিশিষ্ট-বৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত যে প্রেম তাহাই সনেটে আত্ম-প্রকাশ করে, স্বতঃ উৎসারিত, বাধাবন্ধনহীন সর্ব্বগ্রাসী যে প্রেম তাহা সনেটের উপজীব্য নয়। তাই সনেটে আবদ্ধ প্রেমানুভূতি সম্বন্ধে এলিজাবেথের যুগে একটা প্রশ্ন জাগিয়াছিল—যে ইহা কি কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি না ব্যক্তি নিরপেক্ষ অনুভূতি? ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাৎকালিক রাজসভার প্রতিবেশে প্রেম-প্রকাশের একটা নির্দ্ধারিত মানদণ্ড ছিল এবং তাহারই প্রকাশ ঘটিযাছিল সনেটে। সুতরাং এ প্রশ্ন সমালোচনার ক্ষেত্রে তখন অপ্রাসঙ্গিক ছিল না। কিন্তু প্রেমের প্রকাশ সনেটের মাধ্যমেই হোক আর লিরিকের মাধ্যমেই হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রেম নিবেদনের ও প্রেম প্রকাশের পিছনে একটা আন্তরিকতা থাকে নতুবা তাহা প্রেমের কবিতা বলিয়া বিবেচিত হয় না, তবে সনেটের মাধ্যমে প্রেমের যে অভিব্যক্তি ঘটে, তাহা বোধ হয় লিরিক-আশ্রিত প্রেমানুভূতির মত ততখানি গভীর নয়। পরে প্রেমের স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইতে সনেট মুক্তিলাভ করে মিল্‌টনে। মিল্‌টন যখন রাজনৈতিক বিষয়কে

উপজীব্য করিয়া সনেট রচনা করিলেন, তখন ইহার ভাবধারা বিস্তৃত হইল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সনেটগুলিতে স্বাধীনতা স্পৃহা, অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস—এরূপ গভীরতার সহিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, এগুলিকে ভেরীনিনাদের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। এই তূর্যধ্বনির সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিরুচি-জড়িত সনেটগুলির ভাবধারা যোগ করিলে দেখা যাইবে যে, সনেট প্রায় সকল বিষয়কেই আশ্রয় করিয়া রচিত হইতে পারে। ইহার পর সার্থক সনেট রচিত হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের হাতে। ইহাদের তুলনায়, শেলী, বায়রণ ও কোলরিজের সনেটগুলি অসংযত ও শিথিলবন্ধ। কিন্তু সনেটের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ নিবিড় অনুভূতি, বিশুদ্ধ ভাবনির্যাস, আত্মানুসন্ধান, একটা গভীর একনিষ্ঠ উপলব্ধি—তথ্যকে আশ্রয় করিয়া যে একটা তথ্যাতীত আদর্শের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ—তাহাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীট্‌সের মধ্যে পাওয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ্য যে কীট্‌সের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার দার্শনিক মনোবৃত্তির সমগ্র পরিচয় আমরা পাই নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কড়ি ও কোমলের' অনেকগুলি সনেটের সুরের সঙ্গে কীট্‌সের সনেটের ঐক্য আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মহাকবির ভাব-পরিণতি দীর্ঘজীবী কীট্‌সের নিকট হইতে আশা করা বোধ হয় অস্বাভাবিক হইত না! সে যাহা হোক, এই উভয় কবিই "ভাবিয়া চিন্তিয়া" একটা ভাবনাকে সনেটের কাঠামোতে চালান দেন নাই—বরং একটা ভাবই যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সনেটে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে সনেট লইয়া অনেক পরীক্ষা হয়। রোসেটী ও মিসেস ব্রাউনিং-এর হাতে সনেট যেন একটা অনুষ্ঠান-বহুল যাজ্ঞিক-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা যেন মন্দির স্থাপনার মত—সনেটের কাঠামোর উপর প্রেমের চূড়া নির্ম্মাণ করা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই মধু-কবিও বাংলা সাহিত্যে সনেট আমদানি করিলেন। স্বল্প-পরিসরে ঘনীভূত ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু সনেটের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তিনি যে ছন্দ ও বাচনভঙ্গী বাছিয়া লইলেন তাহা মহাকাব্য রচনার পক্ষে ভূষণ হইলে, সনেটের পক্ষে দূষণ হইল। আত্যন্তিক উচ্ছ্বাস লিরিকে সচল আর তাহার সার নির্যাস বা ঘনীভূত অংশটুকুই সনেটে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পংক্তির মধ্যে প্যারানথিসিস্ বা বন্ধনী মধ্যস্থ অবান্তর বাক্যপ্রয়োগ-এর ফলে সনেটের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। ফলে মধু-কবির মধ্যে আত্ম-সংযম

থাকিলেও এই আধিক্য মহাকাব্যিক বাচনভঙ্গী ও উপমা বিন্যাস প্রভৃতির জন্য তাঁহার সনেটগুলি দোষাতিক্রান্ত হয় নাই। পরিশেষে যে সম্বোধনের আতিশয্য তাঁহার মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'-এ অশোভন হয় নাই, তাহাই বহু সনেটে ত্রুটি স্বরূপে দেখা দিয়াছে—বড় অস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ হইলেও ছোট অস্ত্র তিনি যেন ভালভাবে চালাইতে পারেন নাই।

বাংলা সাহিত্যের সনেটে আর একজন রথী হইলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। ভাবে-ভাষায় ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় তিনি মধুসূদনকেও যেমন অনুসরণ করিয়াছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সনেটের কাঠামোকেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার একটা নিজস্বতা ছিল। কিন্তু তৎরচিত সনেটে ভাব পরিণতি থাকিলেও অসংযত উচ্ছ্বাস প্রবণতা এবং কল্পনার সূক্ষ্ম অথচ ক্ষণস্থায়ী লীলাচাপল্য থাকার জন্য ইহার গাঢ়বন্ধতা নষ্ট হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরী এই সব রথী-মহারথীদের আবহাওয়া-পুষ্ট হইয়াও একটা নিজস্ব ধারা সনেটে প্রবর্তন করিলেন। আমরা ইহাকেই 'কালাপাহাড়ী' রীতি বলিয়াছি।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সনেটের চিরাচরিত আকৃতি তিনি স্বীকার করেন নাই এবং সনেটের প্রকৃতিগত বিচারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্য হইতে উদাহৃত হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথবাবুর সনেটগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এখানেও সেই কালাপাহাড়ী রীতি বর্তমান। তৎরচিত সনেটে তাঁহার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সেখানে রহিয়াছে চিন্তাশক্তির প্রাধান্য, নূতন নূতন মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার সনেটগুলি প্রধানতঃ হাস্যরস-প্রবণতা উদ্ভূত। অথবা বলা চলে যে, ব্যঙ্গপ্রেরণা ও মননশীলতা এখানে পাশাপাশি বর্তমান। কবিতার কমনীয়তা, কল্পনা-প্রাধান্য ও ভাবালুতা তাঁহার সনেটে বিশেষ দেখা যায় না, বরং মননপ্রধান ও তীক্ষ্মযুক্তিবাদী মনের পরিচয়ই সেখানে মিলে। আমাদের ধারণা, অনেক লেখক যেমন উভচর হইয়া গদ্যে ও পদ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনাতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না—তাঁহার গদ্যে ও পদ্যে একই মন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে তাঁহার দু-একটি সনেট বিশ্লেষণ করিলে আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। সনেট পঞ্চাশৎ-এর প্রথমেই পাই "সনেট" শীর্ষক একটি কবিতা।

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্ত্যে সনেটে সাকার।

একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরু শিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !
নীরব কবিও ভাল মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে ধরে না আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
একথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ।
ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।
ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ,—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।

আলোচ্য সনেটে ৯ম ও ১০ম পংক্তিতে ক্লাইম্যাক্স বা চরম পরিণতি সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই ঘটিয়াছে আকস্মিক অবতরণ—ইহা যেন স্বেচ্ছায় রোমান্স বিরোধিতা—এমন কি শাসন-সংযত সনেটকার গুরুর সঙ্গে পরিহাস করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত নহেন। কোথায় রহিল ভাবের একনিষ্ঠতা—দৃঢ়বদ্ধ সনেটের কেন্দ্রাভিমুখিতা—পরিবর্তে পাইলাম ব্যঙ্গপ্রেরণা মিশ্রিত বিচার-বুদ্ধির সূক্ষ্ম প্রকাশ। "নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।" "একথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ।" বোধকরি এই পংক্তি কয়েকটির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্নবাবুর মধ্যে "নীরব কবি" লইয়া যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায় অর্থাৎ সনেটকার এখানে বলিতে চাহেন যে, যাঁহার কল্পনা নিজের কাছে উজ্জ্বল চিত্রের মত প্রতিভাত নয়, তিনি "অন্ধকবি।" কবির যদি প্রত্যক্ষ দর্শন না থাকে, তাহা হইলে পাঠকের কাছে তিনি কিরূপে স্পষ্ট হইবেন। এক কথায় যাহার কল্পনার সুষ্ঠু বাণীরূপ নাই, তিনিও যেমন অস্পষ্ট, তাঁহার কল্পনাও সেইরূপ অসুস্থ কল্পনা—উচ্ছ্বাস মাত্র। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত-মূর্খের উল্লেখে যেরূপ যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার তির্যক উক্তির সন্ধান মেলে "অপরে ক্রন্দন" কথাটির মধ্যে। শেষের চারি পংক্তিতে আবার আতরঞ্জনের দ্বারা হাস্য রস জমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবিতার ছন্দে মিল পরোক্ষ, অলক্ষ্য ও সূক্ষ্ম হইলেই কবিতার উৎকর্ষ ঘটে, কিন্তু আলোচ্য

সনেটকার সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় মিলের আতিশয্য দেখাইয়া কৌতুক করিতেছেন।

এই ভাবে কতকগুলি সনেটে সংস্কৃত কবিদের সমালোচনা করা হইয়াছে, কতকগুলি সনেটে তাঁহার জীবনদর্শন ব্যক্ত হইয়াছে, কোথাও বা তিনি সংস্কৃত নাটকের নায়িকা বা ঐতিহাসিক তথ্যকে উপজীব্য করিয়াছেন, আবার কখনও বা কতকগুলি নির্বাচিত পুষ্পের সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ক্ষেত্র বিভিন্ন হইলেও সর্বসময়ে একটা বিশেষ দৃগ্‌ভঙ্গী আমাদের বিস্ময় বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। উদাহরণ স্বরূপ "ভাস" শীর্ষক সনেটে তিনি "প্রসন্ন বিভাস" এর সঙ্গে কবি ভাসের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বিভাস রাগিণীর বৈশিষ্ট্য যেমন পবিত্র প্রসন্নতা, শুদ্ধ স্বরগ্রামের মাধ্যমে যেমন ইহার রূপ ফুটিয়া উঠে, তেমনি আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম ভাব-বিলাসের মধ্যে ভাসের আতিশয্যহীনতায় তাঁহার কবি-কৃতি যেন নব সূর্যোদয়ের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মধ্যে "বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদ গদ ভাব" ছিল না—"মহাপ্রাণ আর্য্য"গণই ছিলেন তাঁহার উপযুক্ত শ্রোতা। "তুমি জানো সমরস বীর ও করুণ"—অর্থাৎ ভাসের কাব্যে করুণ ও বীর রসের পার্থক্য নেই—কিন্তু তাঁহার "স্বাধ্যায় পবিত্র"-বাণী সুকুমার আতিশয্যের মত ক্ষয়িষ্ণু নয়। কবি প্রমথনাথ চৌধুরী ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। আবার "জয়দেব" শীর্ষক সনেটে, জয়দেব বর্ণিত অনঙ্গের ভাবাসঙ্গ প্রসঙ্গে তিনি নিজের ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যের সার্থক ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আদিরস ছাড়াও দেহ সম্ভোগের অতি পল্লবিত বিস্তারের মধ্যে কবি জয়দেব একটা বিকৃত ক্ষাত্র শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন।

"উন্মাদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে
রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে।"

দেহ-সম্ভোগের সঙ্গে রণক্ষেত্রের সামঞ্জস্য স্থাপন ও তাহার মধ্যে বিকৃত ক্ষাত্র শৌর্যের যে স্বেচ্ছাচার কবি তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং এই ব্যঙ্গাস্ত্র তিনি জয়দেবের অস্ত্রশালা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন।

"পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন,"

কিন্তু জয়দেব তো কেবল আদিরসের কবি নহেন, রাজা লক্ষ্মণ সেনের দিগ্বিজয় প্রশস্তিতে তিনি বীররসেও তো ভাসিয়াছিলেন। কবি কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। অন্যদিকে "ভর্তৃহরি" শীর্ষক সনেটে সনেটকার তাঁহাকে একাধারে "যোগী ও ভোগী" রূপে সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভর্তৃহরি "নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা।"—তিনি বিশ্বের নশ্বরতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়াও "বিশ্বরূপে মুগ্ধ।"—এই ভাবে এই সনেটের মধ্যে একটা প্যারাডক্সের বা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে ভর্তৃহরি সম্বন্ধে এই বৈপরীত্য কি সন্দেহ নিরপেক্ষ? আসল কথা এই যে, এই সকল কবির আলোচনায় তাঁহার বিচারের মানদণ্ড যথার্থ হইয়াছে কিনা তাহা গৌণ, মুখ্য কথা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সংস্কৃত কাব্য হইতে একটা অম্লমধুর রস আহরণ করিয়া পাঠকগণকে সেই রস পরিবেশন করা ও বুদ্ধিবৃত্ত পাঠকগণকে একটু নাড়া দেওয়া।

এই ভাবে পুষ্প পর্যায়ের সনেটগুলিতেও এই একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুষ্প পর্যায়ের কবিতা সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়—ইহাকে আশ্রয় করিয়া কত কবির কত কাব্য কত না তত্ত্ব। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী দেখাইলেন যে, যে পুষ্পে ভ্রমরের পদাঘাতও সহ্য হয় না. তাহাকে তত্ত্ব চাপাইতে গেলে একটা পরিমিতি থাকা প্রয়োজন। এখানেও তাঁহার মননশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে, আবার পুষ্প নির্ব্বাচনে তাঁহার ব্যঙ্গপ্রেরণা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তিনি এমন কতকগুলি পুষ্প নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহাদের কবি-প্রসিদ্ধি নাই, এমন কি তাহাদিগকে কাব্যের উপেক্ষিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ "কাঁঠালী চাপা"কে লওয়া যাইতে পারে, আবার ইহার মধ্যে কবির যে ব্যঙ্গ মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও জীবন-দর্শন জাত। মানুষের মধ্যে যেমন অনেকে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় স্বজাতি হইতে বিচ্যুত ও মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে বিশ্লিষ্ট হন, তেমনি কাঁঠালীচাঁপাও এই জাতীয় প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। "দু'মনা করা" শুধু পুষ্পের ক্ষেত্রে নয়, মানবের জীবনেও ব্যর্থতা আনে। কাঁঠালীচাঁপার পত্র-সন্নিবেশ "গম্বুজ"। তাহার মধ্যে পাতার বর্ণ, ফলের তীব্রগন্ধ ও ফুলের আকৃতি এই সব কিছু বর্তমান আছে বলিয়াই, সে না হইয়াছে পাতা, না হইয়াছে ফুল। তাই তাহার এই দুর্গতি।

"পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হ'তে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার,

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ
স্বধর্ম্ম হারিয়ে হ'লে স্বর্ব্বজাতি বার।"

পুষ্প-পযায়ের কবিতাগুলির মধ্যে আর একটি বিশেষ অথচ সাধারণ লক্ষণ এই যে, তিনি নির্ব্বাচিত পুষ্পগুলির মধ্যে একটা না একটা সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই "কাঠ মল্লিকা" সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

"গুপ্ত হয়ে থাক তুমি বন অন্তঃপুরে।
মায়া তব গন্ধরূপে ছড়াও সুদূরে।"

কাঠমল্লিকার অপূর্ণতার জন্যই বোধহয় কবি বলিয়াছেন,

"আকাশ দেখিনি কভু সুনীল বিপুল,
ঘনচ্ছায় বনে আছ নেত্র নত করি।"

অন্যদিকে প্রায় সকল কবিই স্বর্ণপ্লাবিত সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্যতার ছবি আঁকিলেও ইহার বৈরাগ্য ব্যঞ্জনার দিকেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কবি রচিত "রজনীগন্ধার" পরিপ্রেক্ষিতে "দিবা" যেন কন্যা "সন্ধ্যা"কে রাত্রিরূপ বরের হস্তে সমর্পণ করিতেছে, রজনীগন্ধা "সেই লগ্নে" ফোটে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্রেমের আভাস। আভিজাত্যহীন গোলাপ নবাব বাদশাহের চিত্তবৃত্তিকে, প্রেম-প্রবণতাকে সুলভে দ্রবীভূত করিতে পারে বলিয়াই কবি "গোলাপ" সনেটে ইহাকে "হকিমী জোলাপ" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। পুষ্পপযায়ের শেষ কবিতা "ধুতুরার ফুল"-এ কবির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই ফুলের সহিত শিবের একটা পৌরাণিক সম্বন্ধ আছে. কবির কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ইহাকে ভালবাসেন এই কারণে যে, ইহা আভিজাত্যহীন ও কাব্যের উপেক্ষিত। এককথায় সনেটের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করিতে গিয়াও কবি তাঁহার ব্যঙ্গনিপুণ কালাপাহাড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। এইজন্য কবি-মনোভাবের সামগ্রিক পরিচয় হিসাবে "ধুতুরার ফুল" সনেটটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

"ভাল আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল,
নারীর আদর পেয়ে যারা হয় ধন্য,
ফুলের বাজারে যারা হইয়াছে পণ্য।
কবিরা যাদের নিয়ে করে হুলস্থুল।" ইত্যাদি।

(বলা বাহুল্য "সনেট-পঞ্চাশৎ"এর প্রায় সকল সনেটেই এই ধরণের বিচার,

এইজাতীয় বাগ্‌বিদগ্ধ ও অম্লমধুর রস-সৃষ্টির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই লক্ষণগুলির মধ্য দিয়াই জীবন দর্শন তথা বিশেষ মনোভাব আভাসিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে সনেটকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকু কতদূর সফল হইয়াছে তাহাই বিচার্য—তাঁহার বিচার অভ্রান্ত কিনা তাহা গৌণ। পরন্তু একথা যে শুধু এই কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল সনেটেই খাটে তাহা নহে, এমন কি ইহার নামকরণের মধ্যেও ইহা সুপরিস্ফুট।) কবি তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়াছেন "সনেট-পঞ্চাশৎ"। পরিভাষার যুগে, তথাকথিত দেবভাষার সঙ্গে ম্লেচ্ছভাষা যোগ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন দুঃসাহসিকতা ও সেইসঙ্গে সৃষ্টি করিয়াছেন চমৎকৃতি। এক কথায় কাব্যের নামকরণের মধ্যেও "কালাপাহাড়ী" দৃষ্টিভঙ্গী দুর্লক্ষ্য নয়। সরস্বতী'কে "বনাত'এ ভাল মানায়, না "বনেট'এ ভাল মানায়, সেকথা ভাবিয়া ভাবিয়া পরিভাষাবিদ্ বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে থাকুন, কিন্তু যিনি আশা করেন "সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।" তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম "সনেট-পঞ্চাশৎ" রাখিয়া যে অনিদ্রায় কষ্ট পাইবেন একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

বহু বিচিত্র সংস্কৃতি-প্রবাহপুষ্ট ভারতীয় পলি মাটির উপর পাশাপাশি গোধূম ক্ষেত ও গোলাপ বাগ যদি দেখতে চাও—চাও অনুভব করতে রৌদ্রদগ্ধ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভারতের কঠোর-কঙ্কালবিশিষ্ট সর্বত্যাগী সন্ন্যাস ও সহস্র আনন্দবন্ধনে আবদ্ধ শান্তরসাস্পদ তপোবন রূপ তাহলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে পাশাপাশি বসাও—পর্যালোচনা কর তাঁদের জীবনচর্যা। এই দুই মহাপুরুষের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মনীষী লুই ফিশার স-সম্ভ্রমে এই উক্তিই করেছেন। সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় ও সর্বমানবীয় কল্যাণ-চিন্তায়, বিরাট ব্যবধানে অবস্থিত এই দুই মেরু কিভাবে একে অপরকে নিবিড় শ্রদ্ধায় আলিঙ্গন করছে—সে কথা উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেন নি। ফিশারের এই সংক্ষিপ্ত অথচ সুগভীর উক্তিকে অনুধাবন করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির জীবনের অনেক ঘটনা, অনেক রটনার সমন্বয় করা দরকার এবং সে কাজ সহজও নয়। কারণ জোড়াসাঁকো ও পোরবন্দরের ভৌগোলিক ব্যবধানের সঙ্গে—মানসিক ব্যবধানও যুক্ত হয়ে আছে। একথা কে না জানে যে, একজন যখন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শ সমন্বিত ও সর্ব বিষয়ে প্রাগ্রসর একটি বিশিষ্ট পরিবারের আভিজাত্য, অন্যজন তখন জন্ম সূত্রে লাভ করেছিলেন এক বিশিষ্ট ভারতীয় কৃষক পরিবার সুলভ ধর্মপ্রাণতা ও সরলতা। একজনের উপরে বর্তেছিল বেদ-বাইবেল-কোরাণের সম্মিলিত প্রভাব, অন্যজনের উপরে রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদগীতার চিরাগত ধারা। কিন্তু কালক্রমে যেন ঘটনা বাধ্যভাবেই এই দুই মেরুর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। সত্যই ঘটনা-বাধ্যভাবে, নতুবা ভাগ্যান্বেষী এক আইনজীবী আফ্রিকায় গিয়ে ভারতীয়দের মর্যাদা রক্ষায় কালা আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নিজে নিষ্ঠুর নিপীড়ন সহ্যই বা করবেন কেন এবং কেনই বা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই জেহাদকে নৈতিক সমর্থন জানাতে এ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ারসনকে পাঠাবেন। কিন্তু এ তো শুধু স্বীকৃতি নয়, এ যে একটি মহতী আবিষ্কৃতি। বস্তুতঃ যে-আবিষ্কৃতি রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ইতিপূর্বেই ঘটেছিল। কারণ গান্ধীজির মহাত্মাজীরূপে আবির্ভাবের পূর্বে সেই মহামানবের পূর্বাভাষ রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন সন্দেহাতীতভাবে আভাসিত যে,

সেটি সাধারণ পাঠকেরও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—অথচ দুজনের মধ্যে তখনও না হয়েছে দেখা-সাক্ষাৎ, না চলেছে আলাপ-আলোচনা। অতঃপর এল ১৯১৫ সাল—এলেন বা আসতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি শান্তিনিকেতন আশ্রমে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম গান্ধীজির কাছে রবীন্দ্রনাথ "গুরুদেব"—ও রবীন্দ্রনাথের কাছে গান্ধীজি "মহাত্মাজী"রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠলেন। ভাবলাম দুই বিপরীত মেরু মিলেছে—এবার শুধু দেখে যাব তাঁদের কার্যকলাপ। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙতে দেরী হল না। কারণ গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, জাতীয় জীবনে চরকা-খদ্দরের ভূমিকা এবং গান্ধীজি-ব্যাখ্যাত বিহারভূমিকম্প প্রভৃতির কারণ নিয়ে তখন সর্বজনবরেণ্য এই দুই মহামানবের মধ্যে মত বিরোধ অতি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমার ধারণা এইসব মতবিরোধিতা এই মেরুদ্বয়কে দূরে ঠেলে তো দেয়-ই নি বরং তাদের মানসিক নৈকট্যকে আরও নিবিড় করে তুলেছিল। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মতবিরোধিতা মানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা এবং ঐকমত মানে নিছক আনুগত্য বা অন্ধভক্তি। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মতবিরোধ বা তার বৈপরীত্যকে এই সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা চলে না। এবং চললে যে বিচার বিভ্রান্তিই ঘটে, তার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্রান্ত প্রমাণ পাই গান্ধীজির নিজেরই উক্তিতে। ১৯৪৫ সাল। মহাত্মাজী তাঁর জীবনের শেষ তীর্থ-পরিক্রমা করতে এসেছেন শান্তিনিকেতন। এসে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিজেকে নিজেই যেন সমালোচনা করেই বললেন,—গুরুদেবের সঙ্গে আমার মতবিরোধের মূলকেন্দ্র অন্বেষণে আমি গোয়েন্দাগিরি করতেও ত্রুটি করি নি এবং বার বার অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি—আমাদের মধ্যে সেই বিরোধ-কেন্দ্রটি আবিষ্কার করতে। কিন্তু অনুসন্ধান শেষে যা পেলাম, তাহল এই যে—সে কেন্দ্রই নাস্তি। সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই পার্থক্য নেই। আমার জীবনে এটি একটি পরম সত্যের আবিষ্কার।

এখন এ উক্তির যাথার্থ্য দেখাতে উভয়ের মধ্যে একটা ব্যাপক তুলনামূলক আলোচনার দরকার। কিন্তু সে পথে না গিয়ে আপাততঃ তাঁদের শিক্ষাদর্শ থেকেই সে কাজটি করা যেতে পারে। প্রথমেই দেখি যে, বহু ব্যয়সাপেক্ষ পাশ্চাত্য-শিক্ষাকে উভয়েই এ দেশের অনুপযোগী বলে বিশ্বাস করতেন। যেখানে কোটি কোটি নিরন্ন মানুষ অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটায়, সেখানে একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষকে বহু ব্যয়ে বিজাতীয় শিক্ষায় বিদেশী ভাবা-

মাধ্যমে শিক্ষিত করতে যাওয়া অপরাধের সামিল। সেইজন্য শিক্ষাকে গজদন্ত-মিনার থেকে আপামর সাধারণের পায়ে-চলা-পথে নামিয়ে আনতে উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন। এর জন্য তথাকথিত স্কুল কলেজ অপেক্ষা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে জীবনের প্রাত্যহিক চলার পথে যে সব অমূর্ত অথচ সার্থক শিক্ষাপীঠ ছড়িয়ে আছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সেগুলি থেকে পাঠ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁরা বড় কাজ বলে মনে করতেন। কারণ শিক্ষিত করা মানে তো শিক্ষার্থীকে সংবাদ স্তূপে পরিণত করা নয়. তাকে পরিবেশ, সমাজ এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র বিশ্বসমাজের সঙ্গে একাত্ম করে তোলা। সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষা পেতে হলে বা দিতে গেলে চাই জাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত উন্মুক্ত আশ্রমিক পরিবেশ—উদার আশ্রমিক সমাজ। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাকে পার্থক্য না বলে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বলাই সঙ্গত। উদাহরণ স্বরূপ, বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার্থীদের দেহ-গঠনের জন্য মহাত্মাজী যখন দিনানুদৈনিক সাফাই থেকে রান্নাবান্না পর্যন্ত সবকিছু তাদের দিয়ে করাতেন, গুরুদেব তখন সে কাজের জন্য মুক্তাকাশের নীচে ছাত্রদের খেলাধূলা ও নানা ধরণের সৃজনাত্মক ও শিল্প কাজে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু লক্ষ্যটা উভয়েরই ছিল ছাত্রদের দেহ এবং চরিত্র গঠনের দিকে। অন্যদিকে উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে ভারতীয় সমাজপূজিত গুরুর আসনে বসিয়েছেন। তাই তাঁদের কাছে শিক্ষক-সান্নিধ্যবিহীন ছাত্র এবং ছাত্র-সাহচর্যবিহীন শিক্ষক অর্থহীন। সুতরাং এই যোগাযোগ যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তার জন্যই তাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একধারে শিক্ষাশ্রম ও গৃহাশ্রমে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ফলে সবরমতী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভৌগোলিক দূরত্ব যাই থাক না কেন—মানসিক দূরত্ব নিয়ে অনুধাবন করলে তাঁদের মধ্যে গরমিল অপেক্ষা মিলের ভাগটাই বেশী ধরা পড়ে। এটা আরও বেশী করে স্পষ্ট হয়, যখন ভাবি যে, শিক্ষায় আধ্যাত্ম-সাধনাকে তাঁরা শূন্যে ঝুলিয়ে রাখেন নি বা অন্যান্য অনেক শিক্ষাবিদের মত সে সাধনাকে ব্যোম-বিহারী কল্পনায় পর্য্যবসিত করে তাঁরা কর্তব্য শেষ করেন নি। বরং উভয়েই বলেছেন যে, দেহ গঠনের জন্য যদি দেহ চর্চার দরকার হয়, ধী-শক্তির উৎকর্ষের জন্য যদি তার অনুশীলনের প্রয়োজন ঘটে, তাহলে ঠিক সেইভাবেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য বিদ্যায়তনে সবাস্তব ও সক্রিয় এবং অনুশীলনের ক্ষেত্র থাকা চাই। এটা যে তাঁদের ফাঁকা আওয়াজ নয়—তা তাঁদের কর্ম্মময় ও আনন্দময় আশ্রম পরিবেশ, দিনানুদৈনিক কার্যতালিকায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও সেইসঙ্গে

শ্রদ্ধাশুদ্ধ সদাজাগ্রত শিক্ষকের ভূমিকা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে। এই পরিবেশ, এই শিক্ষকই ছাত্রদের মানস-মুকুল ফোটাবে—তাদের আধ্যাত্মিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহজ ও সবল করে তুলবে। সত্য বলতে কি, ভারতবাসীর আর্থিক দারিদ্র্য অপেক্ষা মানসিক দারিদ্র্যই তাঁদের সবচেয়ে বেশী বেদনা দিয়েছিল। তাই উভয়েই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকেই জীবনসাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এর পূর্ণরূপের সন্ধান মেলে ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় ও শান্তিনিকেতন আশ্রমে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসলে এ দুটিতে যথাক্রমে টলষ্টয় ফার্ম ও শিলাই-দহকেই বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে। এইভাবে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলে যে ভারতবাসীর আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এক কথায় সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ঘটবে, সে কথা যেমন তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তেমনি সেই মুক্তি-জাহ্নবীর পথ প্রশস্ত করবার জন্য যে আশ্রমিক শিক্ষাই একমাত্র ভগীরথ, সে সম্বন্ধেও তাঁরা দ্বিধাহীন ছিলেন। এর ফলে জাতীয় জীবনে যে স্বয়ম্ভরতা—যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আসবে—তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে জাতিকে আত্ম সংহরণের পথে ঠেলে দেবে না—বরং এগিয়ে দেবে আত্মসম্প্রসারণের পথে, সহাবস্থানের পথে, বিশ্ব জাগতিকতার পথে। তবু যদি এই দুই মহান শিক্ষকের পথ ও মত নিয়ে বিতর্ক ওঠে—তাহলে শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকব যে, মহাত্মাজী চেয়েছিলেন—ভিতটাকে মূলকাঠামোটাকে শক্ত করতে—প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে আপামর ভারতবাসীর ন্যূনতম দাবি আগে মেটাতে। বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রথমে সমগ্র জাতির বনেদ গড়ে উঠুক, তার প্রাথমিক দাবিগুলি আগে পূরণ করা হোক তারপর তার উপর সৌধ নির্মাণের কথা চিন্তা করা যাবে। অপর দিকে কল্পনা-লক্ষ্মীর অধিপতি বিষ্ণুর মত গুরুদেব চেয়েছিলেন মূল থেকে চূড়া পর্যন্ত সব কিছু গড়ে উঠুক এক সর্বাবয়ব বিশিষ্ট শিক্ষাদর্শের ভিতর দিয়ে। ফলে তাঁদের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্র হল মাত্রাগত—প্রকারগত নয়। কালোয়াত যেমন একই তালের মধ্যে মাত্রাসমষ্টিকে হ্রস্ব-দীর্ঘ করে ছন্দোবৈচিত্র্য আনেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্যান্য শিল্পকর্মের মত শিক্ষা শিল্পেও একটা তাল বজায় রেখে, তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য—অনেক সুষমার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। আর গান্ধীজি শিক্ষা জগতের একটা তাল ধরে তার মধ্যে মোটা মাত্রা-বিভাগটাই দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং উভয়ের তালটা ঠিকই ছিল এবং যা কিছু পার্থক্য তা হল তাঁদের মাত্রা ও ছন্দোবন্টনে।

শিশু সাহিত্য ও সুকুমার রায়

সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, শিশু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়েও তেমনি মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু সে তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়েও একটা কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, শিশু সাহিত্যের জাত আলাদা এবং এর রচয়িতাও আলাদা জাতের। সাহিত্যে যাঁদের আমরা সিদ্ধহস্ত ও সাবালক বলে অভিহিত করি, তাঁদের সৃষ্টি সাধারণতঃ সাবালক পাঠকদের পুষ্টি যোগালেও নাবালকদের ধাতে সয় না। কিন্তু রহস্য এই যে, সার্থক শিশু সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছেন, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরাও আদৌ নাবালক নন, বরং আড়ে বহরে বেশ প্রৌঢ়। পুরাণ-বর্ণিত কোনও কোনও বীর নাকি কারও কারও বরে নিজেদের ইচ্ছামত ছোট বা বড় করতে পারতেন। আমার ধারণা এই সব প্রৌঢ় সাহিত্যিকও হয়তো কোন দেব-দেবীর বরে ঐ জাতীয় একটা ঐচ্ছিক সম্পদের অধিকারী। নতুবা শিশুর আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা, কৌতুক-কৌতূহলকে তাঁরা শিশুর মত অনুভব করেন কি করে? কিন্তু অনুভূতিই শেষ কথা নয়—শিশু সাহিত্যে তার রূপায়ণও হবে শিশু সুলভ। অর্থাৎ শিশুর কথা প্রৌঢ়ের কাছে অর্থহীন বা অস্পষ্ট নয়, বরং অর্থময় ও বাঙ্ময়, তেমনি তার সাহিত্যিক রূপায়ণেও সেই গুণটি থাকা চাই-ই। সাদা কথায় এই জাতীয় রচনায় লেখককে শিশু হয়ে শিশুর কথা বুঝতে হয় এবং বোঝাতে হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের উদ্দেশ্য করে "শিশু ভোলানাথ" রচনা করেছেন। কিন্তু তাকে শিশু সাহিত্য বললে বোধ হয় ভুল করা হবে। কারণ ও-গ্রন্থ শিশুদের উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও—শিশুদের জন্য লেখা নয়। ও-কাব্য বুঝতে শিশুর তো দূরের কথা শিশুর পিতাকে বেগ পেতে হয় যদিও তার দু-চারটে কবিতা শিশু সাহিত্যের অন্তর্গতই বটে। আসল কথা হল শিশু সাহিত্য একান্তভাবে তাদেরই জন্য, যারা পড়তে শিখছে বা সবে মাত্র শিখেছে। সুতরাং তাদের খোরাক দিতে পারে যে সাহিত্য, তাই আসলে শিশু সাহিত্য। উদাহরণের জন্য আবার রবীন্দ্রনাথের কাছেই দ্বারস্থ হওয়া যায়। তাঁর সহজ পাঠ প্রথম ভাগের প্রথমেই চোখে পড়ে:—"ছোট খোকা বলে অ আ/শেখেনি সে কথা কওয়া।" আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাই:—"ঘন মেঘ বলে ঋ/দিন বড়ো বিশ্রী।" আপাতদৃষ্টিতে এই সব মন-ভোলানো কান-জুড়ানো শ্লোকের কাজ হল, অক্ষর পরিচয় করানো। অথচ মজা এই যে, অক্ষর পরিচয় করিয়েই এ শ্লোক ক্ষান্ত হয় না—বরং শিশুর অজ্ঞাতসারে তাকে তার রূপ-রস-শব্দ-

গন্ধ-স্পর্শভরা ধরিত্রীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে সাহিত্য পাঠের তার দীক্ষা শুরু হয়ে যায়। বস্তুতঃ এই জাতীয় শ্লোকেই তার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠে—তার মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়—তার মানস মুকুল দল মেলে। এ শ্লোকের ছন্দ দোলায় চড়ে সে ছবি আঁকে—ছবি দেখে।

আমরা কিন্তু ঐ সব শ্লোক-সংলগ্ন আচায নন্দলাল বসুর আঁকা প্রাসঙ্গিক ছবির কথা বলছি না। সে ছবির মূল্য অবশ্যই আছে এবং খুব বেশী করেই আছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ-রচিত শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গত করে গেছেন তার মূল্য অস্বীকার করবে কে? কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দাবি হল—শিশু সাহিত্যে পাঠ্য বিষয়টাই যেন একটা ছবি হয়ে ওঠে। "ঘন মেঘ বলে ঋ" শ্লোক পড়তে গিয়ে শিশু মনে যে ছবি ভেসে ওঠে, যে অবারিত কল্পনার আকাশে সে মুক্তবিহঙ্গমের মত পাখা মেলে, সেই ছবিই তার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ। অন্যদিকে এই মূল ছবিটাই যদি আঁকা ছবি দিয়ে ম্লান হয়ে যায়, তাহলে সেটি মুছে দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে যে রচনা শিশুমনের উপযোগী ও তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর এবং যার মধ্যে শিশুসুলভ সাহিত্য বাচকতা থাকবে—তাকেই শিশু সাহিত্য বলে গণ্য করা উচিত, তা সে পদ্যেই রচিত হোক—আর গদ্যে রচিত হোক।

অবশ্য একথা ঠিক যে—এ সাহিত্যের আদিপর্বে শ্লোকেরই প্রাধান্য। কারণ যাদের এখনও অক্ষর পরিচয় হয়নি, তাদের জন্যই একাধারে মধুক্ষরা এবং মধুরাক্ষরা শ্লোকের দরকার। ফলে এই জাতীয় সম্পদের সন্ধান যখন তারা পায়, তখন সানন্দে সেটি আয়ত্ত করতে বার বার তাকে আবৃত্তি করে। এখানে তারা তাদের উপযোগী বাণী পায়—বাণীচিত্র পায়—পায় ছন্দের পক্ষী-রাজ ঘোড়া। এমনি করে সে শ্লোক তাদের কাছে "রসনা-রোচন-শ্রবণ বিলাস" হয়ে ওঠে এবং তাদের মানস-অভিসারে নিয়ে যায়। কিন্তু তার অন্ত্য পর্ব্ব যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা বলা কঠিন। অতঃপর শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে এই ভূমিকাটুকু মনে রেখে রবীন্দ্রোত্তর শিশু সাহিত্যিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুকুমার রায়কে ধরা যেতে পারে।

ইনি সাধারণতঃ শিশু সাহিত্যিক বলে পরিচিত হলেও মনে হয়, এটিই এঁর শেষ পরিচয় নয়। কারণ যে সাহিত্য ব্যঙ্গ ও রঙ্গ দিয়ে মানুষের প্রৌঢ় অনু-ভূতিকে নাড়া দেয়—তিনি সেই সাহিত্য-গুণেরও অধিকারী। অন্যদিকে শিশুর দলও তাঁর লেখায় যা চায়, তাই পায়। পরিণত মানসিকতার দিক

থেকে আপাতদৃষ্টিতে যা উদ্ভট অথচ স্থির দৃষ্টিতে উদ্ভাব্য—শিশু মনে তাই একান্ত সহজ ও সরল হয়ে দেখা দেয়। এর একটা বড় প্রমাণ হল—আজব দেশে এলিসের কাণ্ড কারখানার শিশু-প্রিয়তা। লুইস্ ক্যারল্ এই বই লিখেই শিশু-চিত্ত জয় করেছেন। ঠিক এইভাবেই সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল" শিশুদের মনোহরণ করেছে। "অসম্ভবের দেশে" বসে যা কিছু উদ্ভট, আজগুবি, তাই দিয়ে তিনি এই বই লিখেছেন এবং বীর শিশুর মত বইয়ের ভূমিকাতেও তিনি সেকথা নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শুধু ঘোষণায় তো বাজিমাৎ করা যায় না, ঘোষিতকে শিশুমনে প্রেষিত করতে হয়। এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় ছন্দ-বন্ধ, ভাষা-ভূষা উপমা-অলঙ্কার সমন্বিত এক বিশেষ ধরণের শাসন-সংযত প্রতিভার। বলা বাহুল্য সুকুমার রায় এই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর আজগুবি কল্পনার পক্ষীরাজ যেমন ছন্দের বল্গায় সংযত হয়ে শিশু-চিত্ত হরণ করে, তেমনি সেই পক্ষীরাজের পথ পরিক্রমার তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে বয়স্কের মস্তিষ্কও বিচলিত হয়ে উঠে।

শিশু সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার বাণীচিত্র। এটি এমন হবে যে—পড়তে গেলেই যেন সেটি অতি সহজ ভাবে বা অজ্ঞাতসারেই শিশু মনে ভেসে ওঠে। সুতরাং সে বাণীচিত্র সংগৃহীত হবে শিশুর একান্ত পরিচিত পরিবেশ থেকে। অথচ রহস্য এই যে, শ্লোকে আবদ্ধ বা গদ্যে লেখা সেই বাণীচিত্র দেখে সে যেন তার পরিচিত পরিবেশকে তার মানসরাজ্যে নূতন করে গড়ে নেবার অবকাশ পায়, -সে যেন তার সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে স্রষ্টারূপে দেখতে পায়। সার্থক শ্লোকে অবশ্য ভাব, ছন্দ ও ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গম স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায়। কিন্তু শিশু সাহিত্যের গদ্যাংশে ছন্দের ঘাটতি পড়ায় লেখককে আরও সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। তাই এখানে তাঁকে সযত্নে শব্দ চয়ন করতে হয় যেমন করে পূজারী পূজার পুষ্প চয়ন করেন—। কানের ভিতর দিয়ে যা মরমে প্রবেশ করে, তা হল শব্দ ঝঙ্কার। সুতরাং শিশু সাহিত্য গদ্যেই রচিত হোক আর পদ্যেই রচিত হোক—শব্দঝঙ্কার তার আবশ্যিক উপাদান। গদ্যে-রচিত শিশু সাহিত্যে শব্দঝঙ্কারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই রূপকথার বেদব্যাস দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে। "কুচবরণ কন্যা", "মেঘবরণ চুল" "শ্বেত পাথর ধব্‌ধব" "দুয়ারে দুয়ারে রূপার কবাট, চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলসী" প্রভৃতি শব্দগুচ্ছই তার সার্থক নিদর্শন। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, সুকুমার রায়ের ছড়াতেও সেই জাতীয় উপাদানের অজস্রতা ও অসাধারণত্ব

এত বেশী যে, অসাবধানী পাঠকেরও সেটি দৃষ্টি এড়ায় না এবং তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, তাঁর আঁকা বাণীচিত্র সার্থক কাব্যশ্রী-সম্পন্ন। "মেঘ মুলুকের ঝাপসা রাতে রামধনুকের আবছায়াতে" দাঁড়ালে বা 'জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন ঘোড়া'য় একবার চাপতে পারলেই সেটি ধরা পড়ে। শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধ না হলে কি কেউ "জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছ", "জোনাকির চকমকি", "আধখানা ভাঙা", "রাতকানা চাঁদ"কে ছন্দের বাঁধনে বাঁধতে পারে? অন্যদিকে "হাঁস ছিল, সজারু (ব্যাকরণ মানি না)/ হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।" বা "আজগুবি নয়, আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা/ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা।" বা "ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ শুনে লাগে খটকা/ফুল ফোটে! তাই বল! আমি ভাবি পটকা।" প্রভৃতি শ্লোকগুলি পড়তে বসলে আমরাও কি কিছুক্ষণের জন্যে শিশু হয়ে যাই না—তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি না? কিন্তু হাসির বাষ্প উবে গেলে দেখতে পাই ওসব শ্লোক শুধু বাষ্প সর্বস্ব নয়, বস্তুগতও বটে। তখন ভাবতে বসি সত্যই তো—আমরা সারাজীবন ধরে শুধু যা নই, নিজেদের তাই বলে জাহির করবার চেষ্টা করছি এবং যা হতে পারব না, তা হবার জন্যই মাথা কুটে মরছি—এর জন্যই বস্তু ছেড়ে অবস্তু, আলো ছেড়ে আলেয়ার, কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছনে পিছনে ছুটছি জীবন ও সংসারসাহিত্যে ব্যাকরণ না মেনে শুধু নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করছি। সত্যি বলতে কি, কোনোও না কোনোও দিক থেকে আমরা অনেকেই এক একটা হাঁসজারু—ব্যর্থ কুস্তিগীর। তাই ফুল ফুটলে আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না—সেখানে সাড়া জাগায় না—সাড়া জাগে পটকার শব্দে। সূক্ষ্ম ও সুকুমার বৃত্তিকে ব্যর্থ জীবন-চর্যায় মেরে ফেলেছি আমরা—তাই চারদিকে আমাদের শুলের রাজত্ব। মানব জীবনের এটাই হল দারুণ দুর্দৈব। অন্যদিকে শিশুর দল হেসে চলেছে আর শিল্পী তাঁর ভাঁড়ার উজাড় করে দিয়ে চলেছেন একের পর এক হাসির খোরাক। সে হাসিতে তাদের বুক ভরছে—কান জুড়াচ্ছে—মন বাড়ছে—আর আমরা? আমরা বহুদূরে ফেলে আসা শৈশব থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে কাঙাল নয়নে তাদের পানে চেয়ে আছি। ভাবছি তাদের আনন্দ ভোজে কি আমাদের আর কোনোদিনই ডাক পড়বে না—তাদের হাসি কি আমাদের বুকে আর কোনোদিনই বাঁশী হয়ে বেজে উঠবে না?

ধর্ম ও শিক্ষা

সরস্বতীর কমলবনে যখন মত্তমাতঙ্গের উন্মত্ত দাপাদাপি শুরু হয় তখন কেবল সাহিত্যিকদেরই নয়, শিক্ষাবিদদেরও টনক নড়ে, অতঃপর শুরু হয় সমীক্ষা এবং সে উন্মত্ততার নানা কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। এই সব কারণের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এগুলি প্রায় এক রকমের, অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার গতানুগতিকতা, রাজনীতির প্রমত্ততা, শিক্ষক সম্প্রদায়ের দায়িত্বহীনতা, ছাত্রসমাজের বিমুখগামিতা ইত্যাদি কারণে ভাবী নাগরিকদের শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের মান নেমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, যা মানুষকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে, যা তাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, সেই ধর্মশিক্ষা থেকে সে আজ বিচ্যুত বলেই তার ছাত্রজীবনে, পারিবারিক জীবনে, এবং সমাজ জীবনে এত বিশৃঙ্খলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে "ধর্ম" কথাটা এত শিথিল ও বহুল প্রযুক্ত যে, ওটার উচ্চারণমাত্রেই অপরের কাছে হয় হাস্যাস্পদ, নয় উন্নাসিক ঔদাসীন্যের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং "ধর্ম ও শিক্ষা" কথা দুটোকে অঙ্গাঙ্গিভাবে ব্যবহার করবার আগে "ধর্ম" বলতে আমরা কি বুঝি, তা সবিনয়ে জানিয়ে রাখা ভাল। কিন্তু তারও পূর্বে দু-একটি প্রশ্ন তোলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সে প্রশ্ন হল এই,—এক, আমাদের চরিত্রগঠন কি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি শিক্ষার দ্বারা সম্ভব, না চরিত্রগঠনে নীতিশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষাকে জুড়ে দিতে হবে? দুই-আমাদের জাতীয় সরকার কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষার প্রবর্তন করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করবেন এবং ছাত্রসমাজকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ভার কি ছাত্র অভিভাবক ও সমাজ-শিক্ষকদের উপরই ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হব?

অবশ্য এমন একদিন ছিল যখন এসব প্রশ্ন বা সমস্যা আমাদের দেশে অনেকখানি অবাস্তব বলে মনে হ'ত। কারণ সে সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার ভার নিতেন পুরোহিত সম্প্রদায়। এঁরা তাঁদের চিত্তকৌলীন্যে যথার্থই পুরোহিত ছিলেন। অন্যদিকে শান্ত সমাহিত তপোবনে বসে যে ছাত্র গুরুর সঙ্গে কণ্ঠ

মিলিয়ে উচ্চারণ করত "ওঁ যো দেবাগ্নৌ যো অপ্সু", যে ছাত্র সমাবর্তন উপলক্ষে আচার্যের কাছে আশীর্বাদ পেত "সত্যম্ বদ ধর্মমাচর" ইত্যাদি, তার কাছে ধর্মসাধনা ও শিক্ষাসাধনার কোনো পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, এইসব শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ ছিল ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, সমষ্টি থেকে বিশ্ব-জীবনে এবং পরিণামে বিশ্বজীবন থেকে অনন্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হওয়া। এখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের প্রথম স্তরে পুঁথির চেয়ে সহজ সরল ব্রহ্মচর্যকেই গুরুত্ব দিতেন। সেইসঙ্গে তারা পেত উদার প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য। ঊষার উদয়ক্ষণে তারা দেখত দেব অংশুমালীর সহস্র কিরণসম্পাতের স্ফুট অস্ফুট বর্ণচ্ছটার সমারোহ এবং সন্ধ্যার শিথিল কবরীতে কোটি নক্ষত্রের দীপ্তি। আবার এই প্রকৃতিই তাদের কাছে একাধারে সংক্ষেপে জীবন্ত পুঁথি, কর্মচঞ্চল গবেষণাগার এবং বিশ্বকোষ বলে প্রতিভাত হতো। এইভাবে শিক্ষা ও ধর্ম তাঁদের জীবনচর্যার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ-চিত্রিত প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষাদর্শ কালক্রমে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, বহুল পরিমাণে বৌদ্ধযুগে এবং কিছু পরিমাণে মুসলমানযুগেও অব্যাহত ছিল। এর একটা বড় হেতু বোধ হয় প্রাচীন ভারতের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। শাসন ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না বলেই এই দুইয়ের মধ্যে কোন জট পাকায়নি।

অতঃপর সে জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটল ভারতে ইউরোপীয়দের অভ্যুদয়ে। ঐতিহাসিকেরা ইউরোপের অষ্টাদশ শতককে "যুক্তির যুগ" বলে অভিহিত করেছেন। এর প্রধান বিশিষ্ট্য হল ধর্মনিরপেক্ষ মানবতা। অষ্টাদশ শতকে ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ যেমন ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তেমনি নবীন শাসক সম্প্রদায়ও নানা কারণে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা উঠেপড়ে লাগলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে। এই টানা পোড়েনের ধাক্কা সামলাবার মত শক্তি তাৎকালিক শিথিল-মূল ভারতীয় সমাজের ছিল না। ফলে তার শিক্ষাব্যবস্থায় একদিকে যেমন তথাকথিত অনেক ভারতীয় মেকলের আবির্ভাব ঘটল, তেমনি অন্যদিকে পচা ভারতীয় ধর্মের ধ্বজাধারীরও অভাব হল না। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তখন থেকে এদেশে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্যদিকে ধর্মসাপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হল। এরপর বর্তমানকাল পর্যন্ত অনেক কমিশন বসল এ নিয়ে, অনেক আলোচনাও হল, তাঁরা চরিত্রগঠনে

নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করলেন। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারলেন না। একদলের কণ্ঠে তো এটাই বেশী করে সোচ্চার হয়ে উঠল যে, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের প্রশ্ন আবাস্তব। কিন্তু অন্যদল তেমনি সোচ্চারে ঘোষণা করলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ সরকার হিসাবে ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষাকে উৎসাহ না দিতে পারেন, কিন্তু ধর্মশিক্ষা যে চরিত্রগঠনের একটা বিশেষ উপাদান, একথা তো তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ পর্বের আজও ছেদ পড়েনি, বরং এটি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। সুতরাং সকলকেই আজ বিশেষ করে ভাবতে হবে এই সমস্যার কথা। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সমস্যা আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র জগতের। ইতিহাস পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ করেছে মানুষের সমাজ-জীবন। এ প্রসঙ্গে যে ইউরোপ অষ্টাদশশতকে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে মাথায় করে নেচেছিল, সেই ইউরোপই বিংশ শতাব্দীতে কি চাচ্ছে, তা ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা উপদেষ্টা মণ্ডলীর (১৯৩৯) রিপোর্ট থেকে শোনা যেতে পারে। এঁরা বলছেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি আজ বিশেষ করে এবং নূতন করে ভাববার সময় এসেছে—প্রয়োজন হয়েছে পাঠ্য সূচীতে ধর্মগ্রন্থ পঠন-পাঠনার। তাছাড়া তাঁদের দৃঢ় অভিমত হল এই যে, ধর্ম-বিবিক্ত মানুষ যতই কেন না ডিগ্রি পাক, প্রকৃত শিক্ষিত বলে অভিহিত হতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শবাদী ফ্রয়েবল্ প্রমুখ অনেক ইউরোপীয় মনীষী ও শিক্ষাবিদ্‌ও এইসুরে এইকথা একক ভাবে বলেছেন। এমনকি প্রয়োগবাদী ডিউই-প্রণীত "রিলিজিয়ন্ এ্যাণ্ড আওয়ার স্কুলস্" প্রভৃতি লেখা পড়লেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শিক্ষায় ধর্মের একটা বিশেষ স্থান আছে। এখন প্রশ্ন হল যে কোন ধর্ম যা একাধারে শিক্ষাকে বাঁচাবে, সমাজকে বাঁচাবে? এখানে রবীন্দ্রনাথের শরণ নেওয়াই সমীচীন বলে মনে করলাম। তিনি বলেছেন :— মানুষ বাঁচে পরম মানুষের জন্য—মনুষ্যত্ব বাঁচে পরম মনুষ্যত্বের জন্যই। কখনো সে বিজ্ঞানে, কখনো দর্শনে কখনো বা সাহিত্যে, আবার কখনো বা সেবায় সে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশ করে পূজায়, প্রণতিতে এবং কর্মসাধনায়। মানুষের ধর্ম হল এই, তা তাকে যে নামই দেওয়া যাক না কেন। এর জন্যই সে "পতনঅভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা" দিয়ে যুগ থেকে যুগান্তরের পানে ছুটে

চলেছে। রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর স্পষ্ট সমর্থন জড়বাদী ইউরোপেও পাওয়া যায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ নানের মতে ধর্মের দুটো দিক আছে, একটা দেহ অপরটি তার আত্মা—তার প্রাণ। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ধর্মের প্রাণকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর মতেও সে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করে মানুষ, তার সাধনার দ্বারা। অনুষ্ঠান অবশ্য সেখানে আছে, কিন্তু সে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য মাত্র—লক্ষ্য তার উদ্গতিতে এবং জীবনের ঊর্ধ্বায়নে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে যে, সমাজে বাস করে মানুষ সমাজের যে সেবা করে, সেই সেবা হল তার অনুষ্ঠান। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সে তার আত্মাকেই সংস্কৃত করে। এইভাবে সত্য-নিষ্ঠায়, সাহিত্য-চর্চায় এবং সমাজ-সেবায় একটা না একটা অনুষ্ঠানকে সে উপলক্ষ্য করে সত্য, কিন্তু তা দিয়ে সে তার ধর্ম-প্রাণতাকেই প্রকাশ করে। এ যেন তার কাছে এক অদৃশ্য পুরুষের অলিখিত অমোঘ আদেশ বিশেষ। এই আদেশকে আনন্দে স্বীকার করে নিয়ে এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম। এতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, এবং চলার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয় তাও সে জানে। তবু সে থামতে চায় না। একেই সে ধর্ম বলে গ্রহণ করে।

এখন দেখা যেতে পারে, যাদের শিক্ষার ভার আমরা নিয়েছি তাদের মধ্যে এই ধর্মপ্রাণতা কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট এবং পরে সহজভাবে অনুবর্তিত হতে পারে। আমাদের ধারণা সে অনুপ্রবেশ ও অনুবর্তনের প্রথম পাদপীঠ হবে তাদের বিদ্যালয়ের প্রসন্ন পরিবেশ। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে শিক্ষকের সাহচর্য। এক কথায় যে পরিবেশ প্রাচীনভারতে একদিন ছাত্রসমাজকে গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালনে আহ্বান জানাত, আজ বর্তমান ভারতে তাকেই নূতন ভাবে সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা জানি প্রাচীন ভারতের তপোবনকে নবীন ভারতে হুবহু ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং এও জানি যে, বিলেত-ফেরতা, আমেরিকা-ফেরতা অনেক শিক্ষাবিদ্ আমাদের বক্তব্যকে হয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন, অথবা সে বক্তব্য শুনে করুণা করে আমাদের দিকে বিজ্ঞজনোচিত এক টুকুরো হাসি ছুঁড়ে দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল নবীন ভারতবর্ষে কি প্রাচীন ভারতের আকাশ বাতাসও মরে গেছে? ভারতীয় সভ্যতার ধাত্রীভূমি আমাদের জরাজীর্ণ গ্রামগুলিতেও কি তপোবন-আদর্শ অনুসৃত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা একেবারে অসম্ভব? সেখানেও কি স্থান সংকুলান হবে না? সেখানেও কি আবাসিক

বিত্যালয় স্থাপন করা নবীন ভারতের পক্ষে অসম্ভব? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পারিক সান্নিধ্যের অভাবে আজ ঘরে-বাইরে সমাজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। অথচ নির্বিকার ঔদাসীন্য এবং বিদেশী-বিস্তুতা প্রস্তুত বিকারে আমরা তার মূলোৎপাটনে এগিয়ে যাচ্ছি না। আমাদের বক্তব্য হল এই যে, গ্রামেই হোক আর নগরেই হোক, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যেন অল্প-বিস্তর আশ্রমের রূপ নেয়। সে আশ্রম-জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সরলতা থাকবে—কিন্তু দরিদ্রতা নয়. পবিত্রতা থাকবে কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ততা নয়। শিক্ষালয় থাকবে—কিন্তু তার চার পাশের দেওয়ালের উচ্চতা বা ভিতরের লৌহ-লোষ্ট্র-ইষ্টকদৃঢ়-ঘনপিনদ্ধকায়া'র গৌরবটাই যেন বড় না হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির "বাহির" বড হচ্ছে, আর "ভিতর" যাচ্ছে গুটিয়ে এবং তার উপর এখান থেকে সহজ সরল ব্রহ্মচর্যকে বিদায় করে তথাকথিত নীতি-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যে নীতিতে শিক্ষা একটা বিশেষ সময়ে কতকগুলি মন্ত্র বা কবিতার চরণ উদ্ধৃতিতে শেষ হয়, তার ফল অপরিণত বয়স্ক ছাত্রের উপর যে কি মারাত্মক হতে পাবে, তা আমরা একবারও ধীরভাবে চিন্তা করি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই জাতীয় নীতি-শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হল সময় ও শক্তির অপচয় করা। শুধু অপচয়েই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি ছাত্র সমাজের মানসিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকেও জটিল করে তোলে। ফলে পরবর্তী জীবনে ধর্মকে নয়, তাবা ধর্মের ভানকে আশ্রয় করতে অভ্যস্ত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম যদি শিক্ষার অঙ্গ হয়—যদি হয় সে জীবনের অঙ্গ, তাহলে তার মধ্যে জীবনের স্বাভাবিকত্বই থাকবে। জীবন যেমন সহজ-ভাবে অন্নজল আলো বাতাস গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হয়, ধর্মও তেমনি সহজভাবে ও স্বাভাবিকভাবে ছাত্রদের মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের ভাবী জীবনে পাথেয় যোগাবে।

অতঃপর শিক্ষালয়ের প্রসন্ন পরিবেশের সঙ্গে আসে আদর্শ শিক্ষকের কথা। কারণ আজ একথা পরীক্ষিত সত্য যে, আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্য ছাত্রের চরিত্র-গঠনের একটি মহৎ উপাদান. অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, আদর্শ শিক্ষক 'কোটিকে গোটিক' মেলে এবং আদর্শ শিক্ষক সমাজেও রাতারাতি গজিয়ে ওঠে না। মনে হয় এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিত্যালয়গুলির একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি ধর্মশিক্ষার ধাত্রীভূমিরূপে সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকেও আগে

আদর্শ শিক্ষকসম্প্রদায়ের ধাত্রীভূমি হিসাবে নূতন করে সৃষ্টি করতে হবে। আজ একথা ঘোষণা করবার সময় এসেছে যে, যে-শিক্ষক জীবনে ধর্ম আচরণ করেন না, সত্য বলেন না, যিনি নিজে ব্রহ্মচারী নন, এবং ভারতীয় ধর্ম, তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধে যাঁর ধারণা নেই, তাঁকে দিয়ে শিক্ষকতার কাজ চলবে না। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি এই জাতীয় শিক্ষককে উপাধি দেওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে তাঁরা দেশের প্রতি একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করবেন।

অন্যদিকে ছাত্রসমাজে ধর্মকে সহজভাবে অনুপ্রবিষ্ট করাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমবেত বা যৌথ জীবনযাত্রাকে সুস্থ ও সবল করে তোলবার দায়িত্ব আমাদের সমাজ ও সরকারকে নিতেই হবে। এতে করে তার চোখের সামনে একদিকে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা দেখে নিজে সে অনুপ্রাণিত হবে, তেমনি অপরদিকে ঐ গুণগুলি যাতে তার অজ্ঞাতসারে তার উপর বর্তায় তার ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডীচেরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটি যে কোন শিক্ষা-শ্রমের আদর্শরূপে গৃহীত হতে পারে। এ দুটি আশ্রমে তথাকথিত ধর্ম বা নীতি শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই নেই। কিন্তু ধর্মের প্রাণ বলতে যা আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি, তা নানাভাবে রয়েছে এ আশ্রম দুটিতে। একটির পরিবেশে আছে "উতরোল চিতরোল সিন্ধুর" অনন্তনীলিমা, অন্যটিতে আছে "খোলা মাঠ ও উদার পথঘাট", আছে "পাখীর গান" ও "বনের ছায়া"। এই পরিবেশেই ছাত্ররা সমবেতভাবে খেলাধূলা, লেখাপড়া, নৃতগীত করবার সুযোগ পায়। এখানকার আকাশে বাতাসে ধর্মপ্রাণতা অনুস্যূত হয়ে গেছে এবং সেটি এত স্পষ্ট যে অত্যন্ত অসাবধানী দর্শকেরও চোখ এড়ায় না। কতদিন দেখেছি শান্তিনিকেতনের প্রভাতী প্রার্থনার গানে আকৃষ্ট হয়ে চলমান বিদেশী পথিক থমকে দাঁড়িয়েছে, পণ্ডীচেরী আশ্রমেও প্রার্থনার সময়ে উপস্থিত হয়ে অনুভব করেছি কিভাবে শত সহস্র মন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। আসলে ধর্ম-প্রাণতার মাধ্যম প্রত্যক্ষ শিক্ষণ নয়, পরোক্ষ অনুভাবন।

পাশ্চাত্য মনীষী জর্জ এ্যালবার্ট কো তাঁর সুবিখ্যাত "সোস্যাল্ থিওরি অব্ রিলিজিয়াস্ এডুকেশন্" গ্রন্থেও ঠিক এই কথাই জোর দিয়ে বলেছেন যে, ছাত্রদের মনে ধর্মপ্রাণতা যদি অনুপ্রবিষ্ট করাতে চাও, তাহলে তাদের সমাজ জীবনে আগে প্রতিষ্ঠিত কর। পরে ধর্মপ্রাণতাকে কর্মের রূপ দিয়ে তাদের

পাশে এনে হাজির কর। দেখবে ধর্মকে সম্মুখে রেখে, 'ধর্ম ধর্ম' করে চেঁচিয়ে যা তুমি করতে পারনি, তা ধর্মের কর্মরূপে অত্যন্ত সহজ হয়ে, তাদের পাশে এসে তাদের জীবনসঙ্গী হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ পাশে পড়ে থাকবে কর্ম, আর মানুষ ছুটবে ধর্মকে লক্ষ্য করে সামনে, এ হতেই পারে না। তাই এ দুটি আশ্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক সমবেদনা সহানুভূতি প্রথমত সীমাবদ্ধ থাকে তাদের চতুঃসীমার মধ্যে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে।

আজ যখন বসে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি তখন দেখলাম আমার সীমান্তপল্লীর গৃহপ্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছেলেমেয়েরা প্রখর রৌদ্র মাথায় করে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য দান সংগ্রহ করতে এসেছে। এরা এমনি করে নানাভাবে ধর্মকে সহজভাবে গ্রহণ করবার সুযোগ পায়। এরা দেখতে পায় যে এ দানভাণ্ডারের প্রতিটি পাই ব্যয়িত হয় দুঃস্থদের জন্য, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সেখানে হিন্দু বা মুসলমানের প্রশ্ন ওঠে না। এমনি করে এখানকার ছাত্র সমাজধর্মকে দেখে কর্মের রূপে। তাই তারা তাদের অজ্ঞাতসারেই উদার মানব ধর্মকে আপন আপন জীবনে বরণ করে নেয়। ছাত্র জীবনে এর চেয়ে আর কোন মহত্তর শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে? এই ধর্ম শিক্ষাকেই শিক্ষালয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমগ্র দেশ আজ দিন গুণছে।